৪১বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০২১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কাণ্ডজ্ঞান	আশীষ লাহিড়ী	৩
মনুস্মৃতি	পি বি সওয়ন্ত	৫
ধর্মনিরপেক্ষতা	তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১
প্রযুক্তির ভাষা	অমিত চৌধুরী	১২
যদি কিছু আমারে শুধাও	ভূপতি চক্রবর্তী	১৩
স্বচিকিৎসা	গৌতম মিস্ত্রী	১৬
ভ্যাক্সিনের অন্তরালে	অরুণালোক ভট্টাচার্য	২০
নুরেমবার্গ মেডিকেল ট্রায়াল	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	২৩
কাগজের কাপ নয়	নন্দগোপাল পাত্র	২৬
শবর সমাজ	ঊষসী চৌধুরী	২৭
হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস	প্রমোদরঞ্জন রায়	৩০
সংগঠন সংবাদ		৩১
সাধারণ মানুষের অসাধারণ কথা		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

মুক্তচিন্তা-তর্ক-বিতর্ক-সামাজিক কুসংস্কার বিরোধিতা -অন্যায়ের প্রতিবাদ এ রাজ্যে নতুন কিছু নয়। এখনও যেটুকু টিকে আছে তা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ডিরোজিও ও পরবর্তীতে বামপন্থী রাজনীতির অবদান একথা ভুললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু সেই উজ্জ্বল উত্তরাধিকার সাধারণ মানুষকে কী আদৌ প্রভাবিত করতে পেরেছে? এই প্রশ্নটা নিয়ে ভাববার সময় খবরের কাগজে যা চোখে পড়ে তাতে এটুকু বোঝা যায় যে বিপরীতধর্মী চিন্তা-ভাবনা আমাদের অনেকটাই গ্রাস করে নিয়েছে। ভয় হয় যখন দেখি একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা বুক ফুলিয়ে অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা করছেন। বাস্তবে কিন্তু তারাই আবার বিজ্ঞানের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধে ব্যবহার করে এমনকি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নবতম অবদান গ্রহণ করে অতিমারীকে ঠেকাবার চেষ্টা করছেন। কোনও দৈববাণী বা টোটকা নয় অতিমারী থেকে বাঁচালে বিজ্ঞানই বাঁচাবে এই সত্যটাকে অস্বীকার করে কার সাধ্যি। তাই দেশজোড়া সমস্তরকম অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে চালাবার প্রচেষ্টার বিষদাঁতকে উপড়ে ফেলতে না পারলে বিষক্রিয়ায় মরা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। আমাদের দেশের সংবিধান যেখানে মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে অথচ সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আশঙ্কার কথা এই যে এমন ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এইভাবে মুক্তচিন্তার টুঁটি টিপে ধরা হচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সেরকমই ইঙ্গিত দেয়। এই বিপজ্জনক প্রবণতাকে রুখতে না পারলে মুক্তচিন্তার সংস্কৃতি শেষপর্যন্ত না ফাঁসিতে লটকে যায়।

১৪ মার্চ ২০২১ একটি বাংলা সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন — ১) প: ব: ব্রাহ্মণ ৩০+/৫'৬'' মাধ্যমিক পাশ কে: স: কর্মচারি তুলা একটা কানের ডিফেক্ট আছে সুশ্রী পাত্রীর জন্য ৩৬-৩৮ স: চা:/ প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ব্যবসায়ি পাত্র কাম্য। হাওড়া ও মেদিনীপুর অগ্রগণ্য। ২) (গণেশায় নমঃ) পূ: ব: কায়স্থ, দাস, কাশ্যপ, নর, স্লিম, সুশ্রী, ৩৩/৫'৫'', B.Tech, ব্যাঙ্ক অফিসার পাত্রীর অদেবারি, প্রতিষ্ঠিত, কলিকাতা ও

তার নিকটবর্তী অঞ্চলের কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য পাত্র চাই। এরকম বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি — ব্যতিক্রমী বিজ্ঞাপন যাতে সম্প্রদায় ও গোত্রের উল্লেখ নেই তা চোখেই পড়ে না।

উৎস মানুষের প্রকাশনা ভাণ্ডারে যে সমস্ত বই রয়েছে হিমানীশ গোস্বামী-র 'বাংলা বনধ বা শেষের শুরু' তার অন্যতম। বইটির চাহিদা তেমন না হলেও তার সারমর্ম আজকের দিনে খুব বেশি করে প্রাসঙ্গিক। কি লিখছেন হিমানীশবাবু— ''এ দিকে নাস্তিকতা বা আস্তিকতা নিয়ে বলার সময় এটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে আস্তিকতার উচ্চচাপে নাস্তিকেরা স্বস্তিতে নেই। চিঠির উপর লেখা হয় শুভ বিবাহ, শুভ উপনয়ন ইত্যাদি। এখানে পরোক্ষে হলেও স্পষ্ট ধর্মীয় ছোঁয়াচ। চিঠির উপরে এখনও লেখা হয় 'শ্রীশ্রীহরি সহায়'। প্রচুর লোক মরবার পর আত্মীয়স্বজনরা খামের উপরে চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন সহকারে বুঝিয়ে দেন চিঠিটিতে রয়েছে মৃত্যুসংবাদ। সঙ্গে অবশ্য 'শুভ শ্রাদ্ধ' কথাটিও ছাপার অক্ষরে দেখেছি। মৃত্যু কথাটা সহজ এবং সরল হলেও সেটি প্রায়ই লেখা হয় না — লেখা হয় অমুক 'সাধনোচিত ধামে গিয়েছেন', 'পরলোকগমন করেছেন', 'গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটছে', 'পারলৌকিক অনুষ্ঠানে', 'ধরাধাম ত্যাগ করেছেন' ইত্যাদি। ...অবশ্য ধরাধাম ত্যাগ করে লোকেদের স্বর্গেই যেতে দেখা যায়— ভয়ংকর চরিত্রের মানুষও স্বর্গে যান এ আমরা স্পষ্টাক্ষরে পড়েছি। যাঁদের বলা হয় নরকেও স্থান হবে না, তাঁরাও চিঠির বয়ান অনুযায়ী স্বর্গেই যান। এ নিয়ে নাস্তিকেরা কিছু বলতে ভরসা পান না। সংখ্যালঘু হওয়ার ওই এক ঝামেলা।''

হিমানীশবাবু সেই ২০০৪-এ এসব লিখে গেছেন। ১৭ বছর পরে চারপাশের পরিস্থিতি আরো খারাপ কিছু ইঙ্গিত দেয়। আরো লিখছেন— ''তবু এই পশ্চিমবাংলায় এখনও অগুনতি লিটল ম্যাগাজিন বেরোচ্ছে। এগুলি ঘোর অন্ধকারের মধ্যেকার প্রদীপ। আলো বেশি দূর পৌঁছয় না ঠিকই, কিন্তু দূর থেকে পথহারা পথিকেরা অন্তত এটা ভেবে নিশ্চিত হতে পারেন যে বাংলার আলো জ্বালাবার লোকেরা সকলেই নিজেদের পেট ভরাট করার পবিত্র কর্মে লিপ্ত হননি।''

আমাদের নির্বুদ্ধিতা যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সাম্প্রতিক উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরেকবার প্রমাণ করে দিল। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উপদেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সব কিছুতে নাক গলিয়ে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষ ও প্রকৃতির চরম ক্ষতি করে চলেছেন।

সম্প্রতি 'প্রমিথিউসের পথে' বইটির ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ১০ টাকা দাম বেড়ে ৫০ টাকা করার পর হিসেব করে দেখা গেল ছাড় দিয়ে ছাপার খরচ ধরে বই পিছু আমাদের হাতে ৫ টাকা থাকছে। বলাই বাহুল্য বই বিক্রি করে যেটুকু থাকে তা দিয়ে আমাদের ঘাটতি পূরণ করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রকাশনার বইগুলির দাম সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের ভেতর রাখাটা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবু সুদিনের আশায় টিকে থাকতে হবে এই জেদ আমাদের চালিকাশক্তি।

খবরে প্রকাশ সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স (এইমস)-এর হৃষিকেশ শাখায় প্রাণায়াম ও গায়ত্রী মন্ত্র করোনা সারাতে পারে কিনা তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। পাশাপাশি এও শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের একই মন্ত্রক সরকারি বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অনুদান কমিয়ে দেওয়াতে সেখানে যাঁরা পিএইচডি ও পোস্ট-ডক্টরেট করছেন তাদের ফেলোশিপ আটকে গেছে।

— সম্পাদকমণ্ডলী

উমা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪
২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বরুণ ভট্টাচার্য
৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।
৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ এপ্রিল, ২০২১ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক
উৎস মানুষ

পর্ব - ১৩

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

ভারতের সংবিধান, হিন্দুত্ববাদী বর্ণান্ধতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা

আশীষ লাহিড়ী

ভারতের সংবিধানের 'মৌলিক কর্তব্য ৫১ এ (এইচ) ধারা'য় বলা হয়েছে : 'ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হবে বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা, এবং অনুসন্ধান আর সংস্কারসাধনের প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটানো।' (*"It shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform".*)

পৃথিবীর সব দেশের সংবিধান অনুধাবনের সুযোগ হয়নি; কিন্তু যে-কটি সংবিধান নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি তার কোনোটিতেই এই 'বিজ্ঞানমনস্কতা' (scientific temper) গড়ে তোলার বিষয়টিকে প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য বলে চিহ্নিত করা হয়নি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সারা দেশে পেটেন্ট ও কপিরাইট সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে ''বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক করণকৌশলকে প্রণোদিত'' করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ে এক নিতান্ত কেজো ও ব্যবসায়িক মনোভাব। বিজ্ঞানমনস্কতার কোনো প্রসঙ্গই এখানে ওঠেনি। একদা বিপ্লবের পীঠস্থান বলে গণ্য চীনের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র প্রকৃতি-বিষয়ক ও সমাজ-বিষয়ক বিজ্ঞানের বিকাশকে প্রণোদনা জোগায়, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঘটায় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জনকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা এবং অভিনবত্বকেও পুরস্কৃত করে।' এখানেও বিজ্ঞানকে মূলত কেজো উপযোগিতার দিক থেকেই বিবেচনা করা হয়েছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া আর জার্মানির সংবিধানে সর্বত্রই বিজ্ঞানকে প্রণোদিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 'বিজ্ঞানমনস্কতা' গড়ে তোলা নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানোন্নত স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলি সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। জাপানের সংবিধানেও কোথাও স্পষ্ট ভাষায় বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশকে নাগরিকদের *কর্তব্য* বলা হয়নি। এ দিক থেকে ভারতের সংবিধান যথার্থই অনন্য।

আশ্চর্যের ব্যাপার বর্ণান্ধ হিন্দুত্ববাদী কোম্পানির মহা মহা পণ্ডিতদের মতে, এই ঘোর পাপেই নাকি ভারতের সর্বনাশ হয়েছে! এই বক্তব্যের একটা অকাট্য প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম *সমতট* পত্রিকায় কলকাতার জগৎপ্রসিদ্ধ ইন্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের 'ফাইন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টিং'-এর বিখ্যাত অধ্যাপক প্রয়াত শীতাংশু চক্রবর্তীর ২০১৩ সালের একটি লেখায়। পণ্ডিত অধ্যাপক মহাশয় সেদিন যেসব তত্ত্ববীজ বপন করেছিলেন, আজ তা বিষবৃক্ষে রূপ নিয়েছে। তাই একটু ফিরে দেখলে মন্দ হয় না। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আমার 'আসুন, বাংলায় ফিরি', দ্বিতীয় সংস্করণ, অবভাস)

তাঁর মতে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ আর সেকিউলারিজ্‌মই হচ্ছে প্রগতির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। — 'ভারতীয় সংবিধানের প্রিঅ্যাম্বেলে ''সেকুলার'' ঘোষণাটি রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য বাইশটি দেশের সংবিধানে এই শব্দটি বর্জিত। উপরন্তু, ভারতীয় সংবিধানে নাগরিক কর্তব্য তালিকায় রয়েছে — ''to develop a scientific temper and a spirit of inquiry''। এ-ধরনের নির্দেশও অন্য কোনো সংবিধানে চোখে পড়েনি। মূলত এসব ঘোষণাগুলি সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ।' তাঁর মতে বিজ্ঞানমনস্ক এবং অনুসন্ধিৎসু হওয়ার অর্থ হল 'সনাতন' হিন্দু সংস্কৃতির বিরোধিতা করা।

তাঁর সরল বিশ্বাস: দূরদর্শনে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' বা 'গণশত্রু' ছবি দুটি 'ব্রাহ্মণের বা হিন্দু দেব-দেবীস্থানের বা হিন্দুদের চিরাচরিত, সুগভীর এবং জীবন্ত বিশ্বাসগুলিকে নষ্ট করার অস্ত্র রূপে ব্যবহার করা হয়। যারা অপকর্মগুলো করছে তাদেরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করে জনসাধারণের

সহজ-স্বচ্ছ বিশ্বাসকে হীন, তুচ্ছ কুসংস্কার বলে দেখানো হয়।' 'সদ্‌গতি' বোধহয় তিনি দেখেননি। আর প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পের প্লটটা যে রবীন্দ্রনাথের, সেটাও হয়তো তাঁর জানা নেই। তাঁর আসল রাগের জায়গাটা এই যে এইসবের ফলে 'অন্য মতাবলম্বীদের', অর্থাৎ মুসলমানদের, 'দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে।'

১৯৪৭-এর পর থেকে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ আর সেকিউলারিজ্‌মের ত্র্যহস্পর্শে যে-সর্বনাশ হয়েছে তার একটা প্রধান লক্ষণ হল মেয়েদের স্বাবলম্বিতা এবং পোশাক-বদল: মেয়েরা শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ ধরায় তিনি মর্মাহত। আরো জ্ঞান অর্জনের অসীম আগ্রহে চোখ মেলে তিনি যখন দেখেন, 'হাত-কাটা আঁটো-সাঁটো ব্লাউজ এবং টাইট জীন্‌স-পরা শামলা মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে হেসে করমর্দন করছে', তখন বুঝতে পারেন, সভ্যতার আসল সংকটটা কোথায়! ফ্রয়েড-পড়া কোনো দুষ্টু লোক হয়তো খেয়াল করবে, প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় শুধু মেয়েটিরই পোশাকের ও চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন, তার 'ছেলে বন্ধুর' নয়। তার ওপর মেয়েদের চাকরি করা? সে তো বিকারের চরম— 'ট্রামে-বাসে-ট্রেনে অসভ্য পুরুষদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, ৮টা থেকে ৮টা পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে মাইনে-দেওয়া বসের ধমক খেয়ে, সহকর্মীদের মন জুগিয়ে বা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি চাকরি করাই কি ঈপ্সিত identity?'

বিজ্ঞান ও সেকিউলার যুক্তিবাদ নিয়ে মাতামাতির আরেকটা অনিবার্য কুফল ছাত্রদের তর্কপ্রবণতা। এর দুটি উদাহরণ দিয়েছেন চক্রবর্তী মশাই। '২০০০ সনে কোনো একটি সর্বভারতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে'র বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি দেশপ্রেমের উপযোগিতা বিষয়ে ছাত্রদের অবহিত করেন। প্রশ্নোত্তর কালে একটি ছাত্র বলে : 'আমি তো জানি না পূর্বাপর জন্মে আমি কোন্ দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। এই জন্মের পর আবার অন্য কোন্ দেশে জন্মাব তাও জানি না। তাহলে স্বল্পকালীন এই জন্মের জন্য ভারতবর্ষের প্রতি দেশপ্রেমের সার্থকতা কোথায়?' অধ্যাপক মহাশয়ের কথামতো জন্মান্তরবাদ যদি সত্য হয়, আত্মার অবিনশ্বরত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে ছাত্রটির এই প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত ও খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু চক্রবর্তী সাহেব এর মধ্যে দেখেন শুধু ঔদ্ধত্য। তিনি বলেন, 'তোমার এই জন্মের গর্ভধারিণী মাকেও তাহলে ভালোবাসার বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই, কী বল?' এই ভয়ংকর স্মার্ট উত্তর শুনে ছাত্রটি কী বলেছিল, সেটা অবশ্য আমরা আর জানতে পারি না।

দ্বিতীয় উদাহরণটি আরো সরেশ। ২০০৩ সালে কলকাতার একটি নামকরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে হিন্দু শাস্ত্র-আশ্রিত 'ভারতের মূল্যবোধের মূল সুরগুলি তুলে' ধরেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। একটি ছেলে তাঁকে প্রশ্ন করে: 'বলতে পারেন ভারতের সতীদাহ কোন্ মূল্যবোধকে তুলে ধরে? রামমোহন রায় কেন এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং এই প্রথা কেবল নারীদের জন্যই কেন প্রচলিত ছিল?' এই অত্যন্ত ন্যায্য প্রশ্ন অধ্যাপক মহাশয়কে 'ক্ষোভে স্তব্ধ' করে দেয়। তারপর তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় সহমরণে প্রবৃত্ত না হলে জোর করে সেটা চাপিয়ে দেওয়া নিশ্চই [যদ্দৃষ্টং] অন্যায়।' স্বভাবতই এ উত্তর ছেলেটিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; সে আবার প্রশ্ন করে। তখন ম্যানেজমেন্ট-বেদান্ত বিশেষজ্ঞর 'ধৈর্যচ্যুতি' ঘটে, তিনি ধমকে বলেন, 'আগে বড়দের এবং অতিথিদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ তারপর দেখা যাবে।'

তিনি জানিয়েছেন — 'এই বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতেই ভারত টানা ১৭০০ বৎসর পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ GDP-র অধিকারী ছিল। ১৭৫০-সনের পর থেকেই অবনতির পালা শুরু হল। দ্রষ্টব্য OECD, Paris-এর World Economy, পৃ ২৬৩-৪।' মজা হচ্ছে, ইতিহাস বলছে, উক্ত ১৭০০ বছরের মধ্যে 'মুঘল আমলেই (১৫২৬-১৮৫৮) ভারত তার ইতিহাসের সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে। ষোলো শতকে ভারতের জিডিপির আনুমানিক হিসেব বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫.১ শতাংশ। ভারতের প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজকোষে বার্ষিক রাজস্ব জমার পরিমাণের আনুমানিক হিসেব ১৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (বিপরীতে, ১৮০০ সালে, অর্থাৎ আকবরের দুশো বছর পরে, তামাম গ্রেট ব্রিটেনের রাজকোষের পরিমাণ ছিল ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড)। ১৬০০ সালে মুঘল ভারতের জিডিপি সারা দুনিয়ার জিডিপির ২৪.১ শতাংশ ছিল বলে আনুমানিক হিসেব।' (*World Bank for GDP in terms of purchasing power parity in 2008; Projections for 2014-2040 by Mr. Mathew Joseph, Senior Consultant, ICRIER*)। অথচ মুঘল যুগ সম্বন্ধে তাঁর হিরন্ময় নীরবতা!

অতএব সাধু সাবধান। কাণ্ডজ্ঞানে ফিরুন। ঝকঝকে মোড়ক দেখে প্রতারিত হবেন না। প্যাকেটের মধ্যে অস্‌লি মাল কী আছে, জানবার চেষ্টা করুন। নইলে পেট এবং মাথা খারাপ হতে পারে।

উমা

মনুস্মৃতি এবং এই দেশ

জাস্টিস পি বি সওয়ন্ত (অবসরপ্রাপ্ত)

মনুস্মৃতি হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সংহিতা হিসেবে পরিচিত। এই দেশ আক্রমণ করার পর, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা এখানে থিতু হওয়ার সময় থেকে যে সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান ছিল, এটিতে তার বর্ণনা রয়েছে। আর্যরা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর, লুটেরা একটি উপজাতি। আর সব লুটেরাই যা করে— তারাও স্থানীয় অধিবাসীদের হাজারে হাজারে হত্যা করেছে, তাদের সমস্ত সম্পদ ও নারীদের লুণ্ঠন করেছে, তাদের ঘরবাড়ি উপনিবেশ ধ্বংস করেছে, শহরগুলিকে ভস্মীভূত করেছে এবং ধ্বংস করেছে তাদের সংস্কৃতি। তখন এই দেশে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুনদীর উপকূলবর্তী এলাকায়, সবদিক থেকেই অগ্রসর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও ব্যবসা। তা নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য জীবন যাপন করত তারা। কোন ধরনের বহিরাগত শত্রুর ভয় তাদের আদৌ ছিল না। তাই তারা ছিল প্রায় নিরস্ত্র ও প্রতিরোধহীন। আর এর ফলেই তারা বন্য, সশস্ত্র, হিংস্র আর্যদের সহজ শিকারে পরিণত হল।

আর্যদের ধ্বংস করা ঐ প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সময়কাল প্রায় ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, যদিও কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তা ৮০০০ বা ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। যদিও তার সমাজব্যবস্থা, ধর্ম ও ভাষার উপর বিশেষ আলোকপাত এখনো হয় নি, তবু এটি অবিতর্কিত যে, আর্য আক্রমণের অন্তত দু'হাজার বছর আগে থেকে এই দেশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা ছিলেন অনেক বেশি উন্নত, এমনকি সভ্য, শান্তিকামী ও তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ। তবে প্রায় সব ঐতিহাসিকই এই দেশের ইতিহাস এমনভাবে লিখেছেন, যেন আর্যরা আসার আগে এদেশে কোনও সভ্যতাই ছিল না।

এটি ঠিকই যে, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ১৯২০ সালে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা প্রথম আবিষ্কার করেন। আর্যরা আসার আগে এখানকার মানুষজন ও তাদের বসতিকে গ্রাহ্য না করা এবং আর্যদের এ দেশের প্রথম অধিবাসী হিসেবে ধরে নিয়ে এ দেশের ইতিহাস লেখার অজুহাত কিন্তু তা হতে পারে না। ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক, এই অবজ্ঞার ফলে বংশানুক্রমে এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, আর্যরাই যেন প্রথম জাতি, যা এ দেশে বসবাস করেছে এবং এ দেশের ইতিহাসও শুরু হয়েছে আর্য-আক্রমণের সময় থেকে।

এই 'আদিম পাপ' সৃষ্টি করেছে অনেক বিকৃতি, প্রতারণা ও বৈষম্য, অতিকথা, পক্ষপাতমূলক বিবরণ, নোংরামি ও মিথ্যাচার, অসত্য ও অর্ধসত্য কথা, পরিহার্য বিবাদ, হিংসা ও রক্তক্ষয়, এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও সন্ত্রাস। আর্যদের দেবতা ও নায়কদের অন্যায়ভাবে স্থানীয় মানুষের দেবতা ও নায়ক হিসেবে চাপানো হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল তাঁদের শত্রু। আর স্থানীয় আদিবাসী মানুষের যে নিজস্ব উপাস্য দেবদেবী ও নায়ক ছিল, তারা হল আর্যদের শত্রু। আর্যদের এই শত্রুদের স্থানীয় মানুষেরও শত্রু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হল, যদিও এরা ছিল তাঁদের নিজেদেরই উপাস্য দেবদেবী ও বীর নায়ক। ধর্ম তথা 'রিলিজিয়ন' সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এটিকে বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ও বলপূর্বক গণধর্মান্তকরণ।

আর্যরা এ দেশে থিতু হওয়ার পর দ্রুত এমন একটি সমাজব্যবস্থা কায়েম করার দিকে অগ্রসর হল, যার ফলে তারা চিরকাল সমাজের শীর্ষে থাকতে পারে, সমস্ত সম্পদের মালিক হতে ও সমস্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হতে পারে। তাদের ভাষা ছিল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সংস্কৃত। এটি এখানকার মূল অধিবাসীদের কাছে অপরিচিত ছিল। আর্যরা ব্যাপারটিকে নিজেদের সুবিধায় কাজে লাগালো। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্ম ও লেনদেনের ভাষা হিসেবে তারা এটিকে প্রতিষ্ঠা করল। ভাষাটির উপর নিজেদের দখল থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক,— সমাজের সর্বস্তরেই নেতৃত্ব হাসিল করতে সক্ষম হল। জ্ঞান হল তাদের একচেটিয়া। সমাজের সব দিক ও ঘটনার, ভাল-মন্দের, ঠিক-ভুলের একমাত্র ব্যাখ্যাকার হয়ে উঠল তারাই।

নিজেদের এই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে তারা, প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে, জনসাধারণকে চারটি পুরোহিত-তান্ত্রিক স্তরে বিভাজিত করল। এদের বলা হল বর্ণ বা জাত। সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার বিচারে, উচ্চ থেকে নিম্ন স্তর অনুযায়ী এই চারটি বর্ণ হল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এই সব মর্যাদা, সুযোগসুবিধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সারাজীবনের জন্য স্থির করে দেওয়া হল এবং বলা হল তা জন্মগতভাবে নির্ধারিত। এগুলি ছিল অচ্ছেদ্য অপরিবর্তনীয় স্তরবিন্যাস। পারস্পরিক বিবাহ থেকে একসাথে খাওয়া— সবই নিষিদ্ধ করা হল।

ব্রাহ্মণরা হল সর্বোচ্চ প্রভু,— প্রকৃতপক্ষে এই ধরাধামের ঈশ্বর। তাদের দেওয়া হল সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা। এই ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যা প্রয়োজন ও কার্যকরী, ঐ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগ করে দেওয়া হল অন্য বর্ণের মানুষদের মধ্যে। এইভাবে ক্ষত্রিয়দের কাজ হল দেশকে রক্ষা করা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা। বৈশ্যদের কাজ চাষ করে, পশুপালন ও বৃক্ষাদি রোপণ করে খাদ্য উৎপাদন করা এবং একই সঙ্গে বাণিজ্য। আর শূদ্রদের কাজ দাস-এর মতো অন্যদের সেবা করা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কাজকর্ম অবশ্যই ব্রাহ্মণদেরও স্বার্থসিদ্ধি করেছে। আর শূদ্ররা এই দুই বর্ণেরও সেবা করত, কিন্তু তা নৈমিত্তিকমাত্র।

ব্রাহ্মণদের কোনও শারীরিক শ্রম করার কথা বলা হয় নি, তাদের কাজ শুধু মস্তিষ্ক ও জিহ্বার। অবশ্যপালনীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, অন্যদের এই দুই অঙ্গকে বিশ্রাম দেওয়া হল। মনুস্মৃতি যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু অধ্যাপনার অধিকার তাদের ছিল না। ব্রাহ্মণরা এই দুই বর্ণকে যে শিক্ষা দিত, তা ব্রাহ্মণদের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তাদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ দুই বর্ণের জন্যও শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা তাদের শাসনকালে কোনও ভেদাভেদ না করে সবার জন্য শিক্ষার প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করার পরই তারা আবার জ্ঞানার্জনের প্রথম সুযোগ পেল। অবশ্য ব্রাহ্মণসহ সমস্ত বর্ণেরই মহিলাদের শিক্ষার কোনো অধিকার ছিল না।

মনুস্মৃতি বিদেশযাত্রাকেও ধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করেছিল এবং তার শাস্তি ছিল প্রায়শ্চিত্ত। এর ফলে বাইরের জগৎ ও মানুষজন, তাদের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে তাদের জ্ঞান, চিন্তাভাবনা ও দর্শনকে না জানতে পারার ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হল। এইভাবে মনুস্মৃতির আরোপ করা ঐ সামাজিক ব্যবস্থাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখা হল। বৈষম্যের মতবাদই ছিল এই ব্যবস্থার দৃঢ়ভিত্তি ও চালিকাশক্তি — বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈষম্য, মানুষে মানুষে বৈষম্য, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য। এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণরা হচ্ছে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, তারা কোনও অন্যায় করতে পারে না, — আর যদি করেও তবে তাদের সামান্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। এমনকি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্রাহ্মণও ছিল শ্রদ্ধেয় ও যোগ্য। একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল সমাজের উপযুক্ত নেতা এবং এমনকি রাজাকেও ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করে দিন শুরু করতে হত। যাই হোক না কেন, সে ছিল ভূ-দেব, পৃথিবীর দেবতা।

আর্যরা বর্ণভেদ প্রথাকে দু'ধরনের উদ্দেশ্যে চালু করার অভিসন্ধি করেছিল। একটি হল, সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা নিজেরা করায়ত্ত করা ও তা সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি হল, সমাজের বাকি অংশকে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্বার্থের নানা উপদলে বিভক্ত করে দেওয়া এবং তাদের পরস্পরের বৈরী করে তোলা। আর্যরা সংখ্যায় ছিল নিতান্তই নগণ্য। তাই এই ধরনের বিভাজন ছাড়া তাদের পক্ষে সর্বোচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজকে শাসন করা সম্ভব হত না, আর এই সামাজিক ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী, দুর্ভেদ্য ও অপরিবর্তনীয় করে রাখার জন্য, ব্যাপারটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা-র দ্বারা তৈরি বলে দাবি করে, তার উপর একটি দৈবী চরিত্র আরোপ করা হল। এইভাবে তাদের উভয় উদ্দেশ্যই পূরণ হল— প্রথমটি, জ্ঞানকে কুক্ষিগত করা; দ্বিতীয়টি, বর্ণভেদ প্রথার সাহায্যে,— যার ফলে একসময় সমাজে ৬০০০-এরও বেশি জাতপাত সৃষ্টি হল— সবগুলিই জন্মনির্ধারিত এবং পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এখনো তা আছে শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে বৈরিতা বেড়েই চলেছে। এবং সর্বোচ্চ বর্ণের মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এটির জন্য নানাভাবে ইন্ধন জোগানোর কারসাজি করে চলেছে।

এই বর্ণভেদ প্রথার কারণে দেশ এখন অসংখ্য সামাজিক গোষ্ঠীতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস এবং নিজেদের দৃঢ়স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সংস্কার,— সব মিলিয়ে চিরস্থায়ি অনৈক্যের উর্বর ভূমি। জাতপাতের স্তর বিন্যাসের কারণে, সবচেয়ে নিম্নবর্ণ বা নীচু জাতের মানুষ সর্বদাই ছিল অপমানিত, নিপীড়িত, শোষিত ও বৈষম্যের শিকার। বর্ণপ্রথার বাইরের লোকেদের সঙ্গে এই নিম্নবর্ণের মানুষদেরও অস্পৃশ্য বলেই গণ্য করা হত। সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয়

মানুষের কুক্ষিগত থাকার কারণে এবং বাকিদের অপরিবর্তনীয় হীন অবস্থার জন্য, সমাজ কখনোই ঐক্যবদ্ধ ছিল না, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল তার অনিচ্ছুক অংশ।

প্রায়শই এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিত। কিন্তু এই সব বিদ্রোহ ছিল, এই ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যেই। শীঘ্রই তা দমন করা হয়েছে। ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে প্রথম দুই পৃথক ধর্মমতের সৃষ্টি হল বৌদ্ধ ও জৈন— যা মনুবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি এবং তার প্রচার ও নির্দেশগুলির দিকে সরাসরি প্রশ্ন তুলল। তখন এমন একটা সময় যখন মনুবাদকে কিছুটা পিছু হঠতে হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম এ দেশে প্রায় এক হাজার বছর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং সম্রাট অশোকের নেতৃত্বে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ধরনের কিছু দেশে এখনো তা সমৃদ্ধ। সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ জৈনধর্মও গ্রহণ করেছিল, যা মনুবাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সম্রাট অশোকের উত্তরসূরী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে, 'পরমপূজ্য' প্রথম শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে, হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের আক্রমণাত্মক আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলে আক্ষরিকভাবেই হাজার হাজার বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করা হয়, তাঁদের শত শত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয় এবং মনুবাদীরা পুনরায় প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে। অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারলেও, এদেশে স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধই মনুবাদী হিংস্র আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। একই ভবিতব্য হল জৈনদেরও।

এখানে যে জিনিসটা দেখার ও মনুবাদী ঐতিহাসিকেরা যেটি সফলভাবে চেপে গেছেন, সেটি হল— যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর্যরা এ দেশ আক্রমণ করা এবং এখানে বসবাস শুরু করার পর নির্দয়ভাবে স্থানীয় জনসাধারণকে হত্যা করেছিল। হিন্দু পুনর্জাগরণের সময় তাদের উত্তরসূরীরাও একই ঘৃণ্য অপরাধ করেছে— বৌদ্ধ ও জৈনদের গণহত্যা করেছে, তাদের ধর্মস্থানগুলি ধ্বংস করেছে।

এখনকার হিন্দুত্ববাদীরা, যাদের শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগই দাবি করে যে, তারা আর্যদের বংশধর, অক্লান্তভাবে এটি জোর দিয়ে প্রচার করে কিভাবে মুসলিম আক্রমণকারীরা স্থানীয় মানুষকে হত্যা করেছে, ধর্মস্থানগুলি ধ্বংস করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের এটিও স্পষ্টভাবে স্বীকার করা উচিত, তাদের পূর্বসূরীরা এ থেকে আলাদা কিছু করে নি। তার ওপর, মনুবাদীরা যখন বৌদ্ধ ও জৈনদের উপর অমানবিক, ঘৃণ্য ও ভয়াবহ অপরাধগুলো করছিল, তখন তারা এই অপরাধের দায় এ দেশে থাকা নিজেদেরই ভ্রাতা-ভগ্নীদের উপর আরোপ করেছিল এবং সেটিও তারা করেছিল হিন্দুধর্মের নাম করে। এছাড়া, যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মনুস্মৃতির ঐ চতুর্বর্ণ প্রথা জন্ম দিয়েছিল অতি নগণ্য সংখ্যার সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী প্রথম শ্রেণির নাগরিকদের এবং অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যার মানুষ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নাগরিক; আর বর্ণপ্রথার বাইরের মানুষদের ঐ সমাজের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতিই ছিল না।

এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে সমাজ ছিল শতধাবিভক্ত। এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন। বিপুল সংখ্যার বাকিদের প্রতি আচরণ ছিল বৈষম্য, শোষণ, অপমান ও দাসত্বের। সর্বনিম্নবর্ণের শূদ্ররা এবং চতুর্বর্ণ প্রথার বাইরের মানুষজন পেত সবচেয়ে অমানবিক ব্যবহার।

আগেই বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মতো যে দুটি বিদ্রোহ প্রধানত ছিল বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, সেগুলিকে গণহত্যা ও চূড়ান্ত নিপীড়নের সাহায্যে দমন করা হয়েছিল। প্রথমে অষ্টম শতাব্দীতে ব্যবসার জন্য পশ্চিম উপকূলে এবং পরবর্তীকালে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মোগল আক্রমণের মধ্য দিয়ে এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ অসন্তুষ্ট, শোষিত ও অপমানিত জনগণের কাছে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার দিশা হিসেবে ভিন্ন ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরজা খুলে দিল।

সবচেয়ে নিপীড়িত ঐ শূদ্র ও বর্ণপ্রথার বাইরের মানুষজনই বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ব্রাহ্মণসহ অন্য বর্ণের কেউ কেউও ইসলামে ধর্মান্তরিত হল। কিন্তু তাদের সংখ্যা নেহাতই মুষ্টিমেয়। সেগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা এবং নিছক ব্যক্তিগত লাভের জন্যই এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

হিন্দুত্ববাদী তথা মনুবাদীরা যা প্রচার করে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা তার উল্টো— জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত মুসলিমের সংখ্যা এদেশের মুসলিমদের শতকরা ৫ ভাগের বেশি নয়। অন্যভাবে বললে, জোর করেই হোক বা স্বেচ্ছায় হোক, যারাই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, আর্যদের আসার আগে তারা এদেশেরই অধিবাসী ছিল এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, তারা অন্যদের মতো একই মনুবাদী সমাজব্যবস্থার অধীনস্থ ছিল।

মনুবাদী সমাজব্যবস্থার অনুগামীসহ এদেশের মানুষদের 'হিন্দু' নামে প্রথম সম্বোধন করে মুসলিমরাই, কারণ তারা 'সিন্ধু' নদীর উপকূলে বসবাস করত (কারণ 'স' তারা 'হ' হিসেবে উচ্চারণ করত)। এইভাবে 'হিন্দু' শব্দটির উৎস হচ্ছে

বিদেশী। আড়াইশ' বছরের মোগল আমলে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ পর্বের পর শুরু হয় দেড়শ' বছরের ইংরেজ সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্ত র। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার মতো একই কারণে নিম্নবর্ণের মানুষরা ধর্মান্তরিত হয় বেশি সংখ্যায় এবং অন্যরা হয় ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য। এই ধর্মান্তরও ছিল স্বেচ্ছায়, সঙ্গে ছিল সামান্য সংখ্যায় এমন ধর্মান্তর যা প্রভাব বিস্তার করে ঘটানো হয়েছিল।

ইসলামে ধর্মান্তর ঘটেছিল বিপুল সংখ্যায়। অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলিমই মর্যাদা ও ক্ষমতা, উভয়ই অর্জন করেছিল, এমনকি জমিদারও হয়েছিল। দেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে তারা বেশি সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত ছিল। ফলস্বরূপ এই সব অঞ্চলে প্রায়শই হিন্দু-মুসলিমের ধর্মীয় বিরোধ বাধত, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন ঘটল।

এইভাবে যাকে এখন হিন্দুধর্ম বলে বলা হচ্ছে, সেই বর্ণভেদ তথা জাতপাতের ব্যবস্থা অন্যথায় সুসংবদ্ধ একটি সমাজের মধ্যে সংশোধনের অযোগ্য ফাটলের সৃষ্টি করেছিল এবং পরিণতিতে দেশের বিভাজন ঘটাল—পশ্চিমে সৃষ্টি হল পাকিস্থান, পূর্বে অধুনা বাংলাদেশ। মনুবাদ এইভাবে শুধু পরস্পর বিরোধী ও অসম নানা সামাজিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করে সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে নি, দেশকেও চিরতরে বিভাজিত করল।

মনুবাদ সমাজের মধ্যে যে অনৈক্যের সৃষ্টি করেছিল, তার ফলশ্রুতিতে এই সমাজ প্রথমে মোগল, তারপর ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসি ও ব্রিটিশদের মতো বিদেশী শক্তির সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের আগে অব্দি দেশটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে এমন ঐক্যবদ্ধ হয় নি। কিন্তু এটি উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত বিদেশী শক্তির শাসনকালেও, মনুবাদী সমাজবিন্যাস অক্ষুণ্ণ ছিল এবং উচ্চবর্ণের মানুষরা সুযোগসুবিধা ভোগ করত। প্রকৃতপক্ষে শাসনব্যবস্থার আগাগোড়া সমস্ত বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে এরা সমস্ত বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং তাদের সক্রিয়ভাবে সমর্থনও করেছে। এমনকি সবচেয়ে অনুগত ও বাধ্য হয়ে তারা ঐ সব বহির্শক্তিগুলিকে সন্তুষ্টও করতে পেরেছিল।

জ্ঞানই শক্তি এবং জ্ঞানই মানুষকে গড়ে তোলে। জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেয়। মনুস্মৃতি সমস্ত বর্ণের নারীদের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করেছিল। মেধাসংশ্লিষ্ট কোনও কাজ তাদের করতে দেওয়া হত না, কারণ এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে তাদের জন্মই হয়েছে শুধু সংসারের কাজ করা ও সন্তান প্রতিপালন করার জন্য। বিগত শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ কাল পর্যন্তও মনুবাদীরা মনুস্মৃতির ঐ নির্দেশ বাধ্য ছেলের মতো মেনে চলেছে এবং তখনকার অনেক আগুনখেকো রাজনৈতিক নেতারাও কেন মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি উচ্চতর তিনবর্ণের জন্য জ্ঞানচর্চার অনুমোদন দিলেও, শূদ্রদের জন্য শুধু জ্ঞানচর্চা নিষিদ্ধই করেনি, জ্ঞানের কোনও কথা শোনাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোনও ধর্মোপদেশ শোনাও ছিল তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তার জন্য চিরতরে শ্রবণক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার মতো নানা শাস্তির বিধান ছিল।

জ্ঞান শুধু মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা ছিল না, সেটিকে খোলসের মধ্যে আটকে রাখাও হয়েছিল। বেদান্ত (চতুর্বেদ এবং তার সহযোগী অন্যান্য সাহিত্য যেমন উপনিষদ, ব্রাহ্মণ্যক, আরণ্যক ইত্যাদি) প্রচারিত হয়েছিল ঐশ্বরিক পরমসত্তার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী হিসেবে। তার বিচার্য সমস্ত বিষয়ে সেটিই ছিল শেষ কথা। এর থেকে কিছু বাদ দেওয়া যাবে না, এতে কিছু যোগ করাও যাবে না। কোনও প্রশ্ন না করে, তাকে মেনে চলতে হবে। আগে বলা হয়েছে যে, তাই পাছে জনসাধারণ ভিন্ন জ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

জ্ঞান এইভাবে হয়ে উঠেছিল খর্ব, আবদ্ধ এবং কর্তৃত্ব করা শ্রেণির সেবাদাস। দেশের বিকাশ হল রুদ্ধ। এই স্থিতাবস্থাকেই কায়েমি স্বার্থ মহৎ বলে প্রতিষ্ঠা করল। এর ফলে অন্যান্য দেশ, বিশেষত পাশ্চাত্যের দেশগুলি যখন শিল্প যুগে প্রবেশ করল তারপরও বহুকাল এ দেশ ডুবে থাকল প্রাচীন সময়ের অন্ধকারে। আমরা এখনো বলি যে ভারত বেঁচে আছে তার গ্রামে এবং তার জন্য গর্বও অনুভব করি।

জ্ঞানের প্রসারকে রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভাষার নির্ণায়ক ভূমিকার ব্যাপারটিও মাথায় রাখা দরকার। আর্যরা সঙ্গে এনেছিল সংস্কৃত, যা ছিল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ইন্দো-আর্য (ইন্ডি-এরিয়ান) একটি ভাষা। এটি এখানকার প্রচলিত ভাষা থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আর কৃষি থেকে শাসনব্যবস্থা— যোগাযোগের সমস্ত ক্ষেত্রের ভাষা হিসেবে শাসকেরা এটিকেই প্রতিষ্ঠা করেছিল; ফলে শিক্ষার মাধ্যমও হয়ে উঠল এই ভাষাই। জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্মের ভাষা হিসেবে থাকল আঞ্চলিক ও স্থানীয় দেশীয়

ভাষা (প্রাকৃত)। আর তাদের কাছে বিদেশী ও রহস্যময় সংস্কৃত হল সম্ভ্রান্ত সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভাষা। ধর্ম থেকে সাহিত্য, শিল্প থেকে ব্যবসাবাণিজ্য— সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর ফলে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটল। বিশেষ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করেই ছিল,— সংখ্যালঘু সুবিধাভোগীদের একটি চক্র, অন্য একটি হল প্রতিকূল অবস্থায় থাকা বঞ্চিত বিপুল সংখ্যার জনগণ। সম্ভ্রান্তদের ঐ বিদেশী ভাষা তথা সংস্কৃত, তার ভিন্ন অভিমুখ, রচনাশৈলী, বাগ্‌ধারা ও ব্যাকরণ নিয়ে এই সামাজিক বিভাজনকে আরো বিস্তৃত করল। এমনকি যাদের শিক্ষার অনুমতি দেওয়া হল, তাদেরও খণ্ড খণ্ড জ্ঞান সংগ্রহের জন্য বিপুল বাধা অতিক্রম করতে হল।

আগেই বলা হয়েছে, মনুস্মৃতি ব্রাহ্মণসহ সমস্ত বর্ণের নারীদের, শূদ্রদের মতোই ঘৃণ্য হিসেবে, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখত। সন্তান ধারণ ও পালনের জন্য তাদের প্রশংসা করা হলেও, অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা ছিল পুরুষের অধীন এবং বাড়ির চাকরবাকরদের থেকে বেশি কোনও মর্যাদা তাদের ছিল না। তাদের কোনও মেধা ও বুদ্ধি নেই, এমনটাই ধরা হত এবং এমনকি আদালতে তাদের সাক্ষ্যকেও নির্ভরযোগ্য মনে করা হত না, তাদের সাক্ষ্যের মূল্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক হিসেবে গণ্য করা হত। শিক্ষার দরজা তাদের জন্য বন্ধ ছিল, ঘরের বাইরের কোনও কাজও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

এদেশে মহারাষ্ট্রের পুনে-তে ১৮৪৮ সালে শ্রী জ্যোতিরাও ফুলে মেয়েদের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মনুবাদীদের প্রবল বাধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী বাঈ এখানে পড়াতেন। পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে, এখানকার প্রথম ছাত্রীরা ছিল শূদ্র ও অচ্ছুৎ গোষ্ঠীর, কারণ অন্যরা মেয়েদের পড়াশোনার উপর ধর্মীয় নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলত। তৎকালীন বাংলার 'West Pargana district' ১৮৪৪ সালে ইংরেজ মিশনারিরা মেয়েদের স্কুল খোলার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা 'ভদ্রলোকদের' প্রবল বাধায় সফলই হতে পারে নি।

এর ফলস্বরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দেশ সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরই কোনও অবদান থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এছাড়া ছিল নারীদের প্রতি ঘৃণ্য অমানবিক ব্যবহারের ভয়ংকর সব প্রথা, যেমন সতীদাহ (স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা, ব্রিটিশরা যা আইন করে ১৮৬২ সালে নিষিদ্ধ করে), বয়োবৃদ্ধদের সঙ্গে কিশোরী মেয়ের বিবাহ, বিধবাদের ন্যাড়া করে দেওয়া, বিধবাদের পুনর্বিবাহ বন্ধ করা এবং আজীবন অন্যের অধীনস্থ থেকে দাসীবৃত্তি করা। যাদের জন্য শিক্ষাদীক্ষার অনুমোদন দেওয়া হল না, সেই নিম্নতর তিনবর্ণের মানুষ অথবা চতুর্বর্ণের সমস্ত নারী— দেশের বিকাশ ও প্রগতির জন্য এই বিপুল জনশক্তির অবদান থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশ বঞ্চিত থেকেছে। যে যৎসামান্য অগ্রগতি হয়েছে তা হয়েছে সমাজের ক্ষমতাসীন ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর দ্বারা। এদের আগ্রহ ছিল শুধু নিজেদেরই স্বার্থ সিদ্ধি করা ও স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা। ফলে শীঘ্রই এই নিকৃষ্ট অংশটি একটি আত্মপরায়ণ কর্দমাক্ত গোষ্ঠীতে অধঃপতিত হল। দেশের চেয়ে নিজেদের প্রতিই এদের অবদান বেশি। সত্যি কথা বলতে কি, এই গোষ্ঠীটি শুধু নিজেদেরই 'জাতি' হিসেবে গণ্য করে। নিজেদের স্বাভাবিক মেধা ও দক্ষতাকে উন্নত করে দেশের প্রগতিতে অবদান রাখার অধিকার ও সুযোগ যদি দেশের সমস্ত মানুষকে দেওয়া যেত, তাহলে মানুষের ইতিহাসের এই পর্যায়ে কি বিপুল উন্নতির শিখরেই না এই দেশ পৌঁছতে পারত, তা ভেবে অবাক হতে হয়। এ ব্যাপারে একটি যুক্তিযুক্ত অনুমানের প্রমাণ হচ্ছে আমাদের এখনকার কিছু অভিজ্ঞতা, যাতে আমরা দেখছি এতদিনকার বঞ্চিতদের শিক্ষিত প্রথম প্রজন্মই কিভাবে বিজ্ঞান থেকে ক্রীড়া, সঙ্গীত থেকে গণিত— সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

নিজেদের পাপ ও অন্যায়কে চাপা দেওয়া আর নিজেদেরই জাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপিত করার জন্য, মনুবাদীদের দ্বারা ইতিহাসের বিকৃতকরণ অপ্রত্যাশিত নয়। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অধিকাংশ বিদ্রোহের নথিপত্র এবং বিদ্রোহীদের উপদেশাবলী ও দর্শন ধ্বংস করা হয়েছে। বিরোধীদের শুধুমাত্র পিশাচ হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি, শারীরিকভাবেও তাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মিথ্যা কিছু দেবদেবী আর নায়কদের সম্মানের সিংহাসনে বসিয়ে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরন্তর প্রচার, ধর্মোপদেশ, শিল্প-সাহিত্য, যাত্রাপালার মতো নানা গণঅনুষ্ঠান ও মেলা-উৎসব, ধর্মীয় আচারাদি, ধর্মের নামে একঘরে করার মতো নানা সামাজিক শাস্তি, গণউন্মাদনা ও নির্বিচার হত্যা, এসব দিয়ে যে সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদের চর্চা করা হয় তার ফলে এক প্রশ্নহীন আনুগত্য অর্জন আর দাসোচিত অনুগামীর সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। অসত্য ও অর্ধসত্যগুলিই শীঘ্র হয়ে উঠল সত্য, প্রশ্নাতীত ও প্রমাণাতীত।

বিপুল সংখ্যক মানুষকে প্রতারণা করার জন্য স্বল্পসংখ্যক

মানুষের দ্বারা কোনও কোনও বিষয়ে গণসমর্থনের সৃষ্টি করা আর শতাব্দীর পর শতাব্দী তা চালিয়ে যাওয়ার এর থেকে বড় উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। Göbbels তার কৌশলগুলি অবশ্যই আমাদের কাছ থেকেই শিখেছে। অসত্যকে বারবার বল, তবে তা সত্যে পরিণত হবে। অজস্র অসত্য কথাগুলিকে আমরা বারবার বলে চলেছি। আর এ কাজ করেছে তারাই যাদের শাসন আর আদেশ করার ক্ষমতা রয়েছে।

যদি কেউ ভাবেন যে, বর্ণাশ্রমের ফলে সৃষ্টি হওয়া উচ্চবর্ণের লোকেদের এই আধিপত্যবাদী মানসিকতা অতীতের ব্যাপার, তাহলে জানা দরকার, এই কয়েকমাস আগেই কেরালা হাইকোর্টের এক ব্রাহ্মণ বিচারক ব্রাহ্মণদের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের কয়েকটি অসাধারণ বিশেষত্ব চিহ্নিত করেছিল; তার মতে, এই সব গুণাবলীর জন্য একমাত্র তারাই দেশ শাসন করার যোগ্য। এর কয়েকদিন পরে গুজরাটের ব্রাহ্মণ রাজ্যপালও একই কথার প্রতিধ্বনি করেন। এঁদের মতো উচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারীরাও যদি এখনো এই ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন, তাহলে দৈনন্দিন জীবনে জাতপাত মেনে চলার জন্য সাধারণ মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না।

এই শেষ নয়। দু'বছর আগে পুনে-তে 'আর এস এস'-এর বর্তমান প্রধান জাতিভেদ অর্থাৎ চতুর্বর্ণ প্রথার সমর্থন করতে গিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, যদি চারটির বদলে একটিই জাতি (বর্ণ) থাকত, তবে দেশের সর্বনাশ হয়ে যেত। 'আর এস এস' বা তার বিজেপি সরকার— কেউই জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করা দূরের কথা, তার বিরুদ্ধেও কখনো কিছু বলে নি।

মনুস্মৃতির গুণগান গেয়ে ভারতের সংবিধান পুড়িয়েছিল যে জনতা, তারা উৎসাহ পেয়েছিল এভাবেই। সংবিধান লাগু হওয়ার এই সত্তর বছর পরেও, আমাদের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে সব ধরনের ক্রিয়াকর্মে মনুস্মৃতিই সংবিধান হিসেবে কাজ করে চলেছে। দলিতদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের যে সব কথা আমরা মাঝেমাঝেই শুনি বা পড়ি তার উৎস উচ্চ-নীচ সর্বস্তরে ছড়িয়ে থাকা এই জাতিভেদ প্রথা।

ড. আম্বেদকর ১৯২৭ সালে মনুস্মৃতি পুড়িয়েছিলেন। পোড়ানো দরকার মনুবাদী মানসিকতাকে। একমাত্র জাতপাতের উচ্ছেদ হলেই জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত হবে। আর অসবর্ণ বিবাহকে প্রথা হিসেবে চালু না করতে পারলে জাতপাতের বিলোপ ঘটবে না। সব জাতের মানুষ একই সাংস্কৃতিক স্তরে না পৌঁছলে তা সম্ভব নয়। সমান সাংস্কৃতিক স্তর অর্জনের জন্য প্রয়োজন সমস্ত বর্ণের মানুষের সমতুল্য শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি। বর্তমানে স্ববর্ণ বিবাহও সম্পন্ন হয় একই ধরনের সাংস্কৃতিক স্তরের পরিবারের মধ্যে। পিছড়ে বর্গের মানুষের জন্য শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা দরকার।

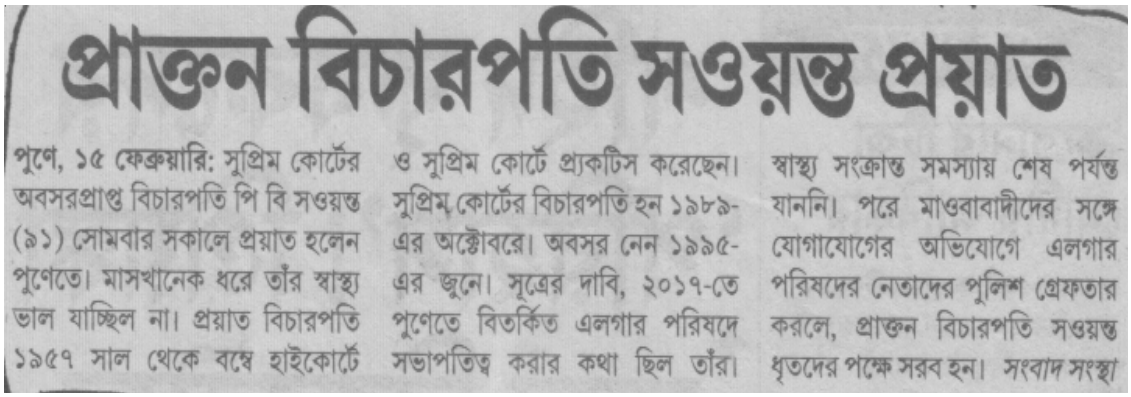

প্রাক্তন বিচারপতি সওয়ন্ত প্রয়াত

পুণে, ১৫ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পি বি সওয়ন্ত (৯১) সোমবার সকালে প্রয়াত হলেন পুণেতে। মাসখানেক ধরে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। প্রয়াত বিচারপতি ১৯৫৭ সাল থেকে বম্বে হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন ১৯৮৯-এর অক্টোবরে। অবসর নেন ১৯৯৫-এর জুনে। সূত্রের দাবি, ২০১৭-তে পুণেতে বিতর্কিত এলগার পরিষদে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল তাঁর। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় শেষ পর্যন্ত যাননি। পরে মাওবাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে এলগার পরিষদের নেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করলে, প্রাক্তন বিচারপতি সওয়ন্ত ধৃতদের পক্ষে সরব হন। *সংবাদ সংস্থা*

সূত্র: আনন্দবাজার ১৬.২.২০২১

দেশের উন্নতি ও প্রগতির জন্য সবার সমান ভূমিকা না থাকলে দেশের ঐক্য ও সংহতি সম্ভব নয়। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে মনুস্মৃতির অনুমোদিত ঐ জাতিভেদ প্রথা বিশাল, অনড় একটি বাধা, যার শিকড় অনেক গভীরে ছড়িয়ে গেছে। তবুও মনুবাদীরা একে টিকিয়ে রাখতে ও শক্তিশালী করে রাখতে চায়। তাহলে কে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, কে দেশদ্রোহী তথা দেশপ্রেমিক নয়?

আমাদের দেশ বিশাল। বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির সমাহার এটি। আমাদের সংবিধান আমাদের দিয়েছে একটি মানবিক, আন্তর্জাতিক, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত বৃহৎ দূরদৃষ্টি। এর উদ্দেশ্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, বিভক্ত করা নয়। এর লক্ষ্য সব নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়ন। সবাইকে সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা দিতে চায় এটি। মনুস্মৃতির মতো সহজাতভাবে অমানবিক, অন্যায্য ও অন্যায় ধর্মশাস্ত্রগুলি আমাদের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অভিসম্পাত। একে কার্যকরী করার জন্য আমাদেরও বিশাল হৃদয়ের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র এবং একেবারে ছোটবেলা থেকেই তাকে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম করার নিরলস প্রচেষ্টা প্রতিদিনই চালিয়ে যাওয়া হয়। শুধুমাত্র ভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, অঞ্চল, জাতি ও এমনকি মতাদর্শ হওয়ার কারণে অন্যকে ঘৃণা করতে কিশোর-কিশোরীদের শেখানোর জন্য অজস্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। এই কেন্দ্রগুলি রাজনৈতিক সহ নানা রূপ ধারণ করে। যতদিন যাচ্ছে ততই আমরা প্রগতির পরিবর্তে, অতীতের দিকে পশ্চাদপসরণ করছি।

এই ধরনের আন্দোলন ও কাজকর্ম যারা অনুমোদন করছে, তাদের বয়স ও শিক্ষাদীক্ষা যাই হোক না কেন, তারা প্রত্যেকেই ক্ষুদ্রমনা। দৃষ্টিভঙ্গী বা জ্ঞান, উভয় দিক থেকেই তারা অপরিণত থেকে যাবে। এই প্রাথমিক সত্যটি তারা অনুভব করে না যে, জন্ম জীবনের একটি দুর্ঘটনা মাত্র। কেউ তার নিজের ইচ্ছায় বিশেষ কোনও পরিবারে জন্মগ্রহণ করে না। তাই বিশেষ কাউকে মহীয়ান করা বা হতমান করার সামান্যতম কোনও কারণ নেই।

যে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, পরজন্মে সে কোন্ পরিবারে কোথায় জন্মাবে তা কি সে আমাদের বলতে পারবে? তাই স্বার্থপরের মতো শোনালেও, পরজন্মে যাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচা যায়, তা সুনিশ্চিত করা কি তার উচিত নয়? আর এই সুনিশ্চয়তার জন্য এই জন্মে একমাত্র যে কাজটি তার করা দরকার তা হল অন্য সবাইকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা ও বন্ধু বানানো। বাঁচো এবং বাঁচতে দাও।

(উৎস: Thought & Action, Oct-Dec. 2020)

ইংরেজি থেকে অনুবাদ — ভবানীপ্রসাদ সাহু

উমা

ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও ভবিষ্যৎ আছে কী?

তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমরা সাধারণভাবে পশ্চিমি রাষ্ট্রের কথা বলে থাকি, যেখানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করা হয়েছে। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হলেও এখানে কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংবিধান-প্রণেতারা বিচ্ছেদ গড়ে তুলতে চান নি। ভারতবর্ষে সংবিধান-প্রণেতারা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সম-দূরত্ব বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা ভারতবর্ষে রাষ্ট্র বাস্তবে ধর্মের সঙ্গে কখনই সম-দূরত্ব গড়ে তুলতে পারে নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে সরকার ভারতবর্ষে ওয়াকফ পরিষদ ও খ্রিস্টিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সীমিত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেও হিন্দু মন্দিরগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না। নেহেরু এক ধরনের পৌর আইন প্রবর্তনের পরিবর্তে চার রকমের হিন্দু বিল প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হিন্দু ধর্মগুরুদের উপেক্ষা করে মুসলিম ভোটের স্বার্থে মৌলবাদীদের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে সরকার বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সম-দূরত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় এবং দক্ষিণপন্থী বিভিন্ন সংগঠন ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এই সংগঠনগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তনে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির পেছনে আরো একটি শক্তি কাজ করে। সেই শক্তি হচ্ছে সমষ্টিগত স্মৃতির বন্ধন। হিন্দু সংস্কৃতির উপর মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ হিন্দু সম্প্রদায়কে অনেকটাই ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

অযোধ্যা, মথুরা ও কাশীর কিছু পবিত্র হিন্দু মন্দির বিভিন্ন সময়ে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার দিল্লিতে মসজিদ তৈরি হয়েছে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ভর করে। কিন্তু হিন্দু শাসনের পুনরুজ্জীবন শুধুমাত্র ছদ্ম

ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে বা সমষ্টিগত স্মৃতির বন্ধনে গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ধর্মীয় চিন্তা বহুমাত্রিক। হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে আমরা দেখি যে ভারতবাসী আস্তিক-নাস্তিক, বৈষ্ণব-শাক্ত, শাকাহারি-মাংসাশি প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। ধর্মের বিভিন্ন পথকে ভারতবাসী গ্রহণ করেছে। রামায়ণের বহু সংস্করণ আর একটি সংস্করণকে বর্জন করে না।

অতীতে ভারতবর্ষে হিন্দুত্ব টিকে ছিল বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

সততা ও সমন্বয় একান্ত জরুরি। কিন্তু সমন্বয় সাধনের পূর্বে প্রয়োজন সত্য উদ্ঘাটনের। কিন্তু সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজন অতীতের স্বীকৃতি। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা অতীত উদ্ঘাটনে সঠিক পদক্ষেপ নিইনি।

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার সফলতা তখনই আসতে পারে যখন আমরা ভারতীয় হিন্দুত্বের বহুমাত্রিক চরিত্রকে উপলব্ধি করতে পারব ও স্বীকৃতি দিতে পারব।

রাজনীতি আজ ভোট-সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে একথা মেনে নিতে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু ভোট-সর্বস্বতার আড়ালে আমরা আদর্শগত লড়াইকে উপেক্ষা করব কী করে? ভোটের লড়াইয়ের পেছনে ধর্মভিত্তিক লড়াইকে আমরা অবজ্ঞা করব কী করে? ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে জনগণের এক বড় অংশ হিন্দুত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। মানুষের ধর্মোন্মাদনা তার রাজনৈতিক আচরণের নির্ধারক হয়েছে। মানুষ অবিবেচক ও স্বার্থসন্ধানী একথা মনে করলে মনুষ্য চরিত্রের ভুল ব্যাখ্যা হবে। শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্বলতার জন্য নয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের লড়াই আজ স্তিমিত হয়ে পড়ায় ভোট রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা আজ পেছনের সারিতে চলে গিয়েছে। পুঁজিবাদী নিয়মে ভারতবর্ষে নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জনগণের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং ভোট-রাজনীতির নিয়ামক হিসেবে ধর্মের প্রভাব কমে আসতে বাধ্য। তখন আদর্শগত লড়াই হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আদর্শগত লড়াই বর্তমান এবং আগামী দিনে নতুন চেহারা নিয়ে আসবে। সুতরাং যুক্তি, বিবেচনার সঙ্গে অন্ধত্ব, নির্বুদ্ধিতার আদর্শগত লড়াই আজও আছে, আগামী দিনেও থাকবে।

উমা

প্রযুক্তি পেরিয়ে — ৩

প্রযুক্তির ভাষা

অমিত চৌধুরী

প্রযুক্তির ব্যবহার করতে বা প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে — জানতে হয় কিছু 'কায়দা-কানুন'। আবার, প্রযুক্তির প্রয়োগের 'পদ্ধতি-ও' এক জানার বিষয়। প্রযুক্তির যে 'স্বয়ংক্রিয়তা' আজ দেখা যাচ্ছে বা প্রযুক্তির সঙ্গে প্রযুক্তির যে 'সংযোগ' সবকিছুতেই কত সংকেত, সংখ্যা বা সমীকরণের কর্মকাণ্ড! যে সব পরিচয়, পরিমাপ বা পরিবর্তন প্রযুক্তির গড়ে ওঠার উপাদান— তা মানুষেরই উদ্ভাবন। গড়ে ওঠা প্রযুক্তির চলন-বলন ঠিক করে মানুষেরই সৃষ্টি করা নকশা। এই সব কায়দা, পদ্ধতি, নকশা, সংকেত, সমীকরণ ইত্যাদিকে বলা যায় প্রযুক্তির ভাষা। এই ভাষা সৃষ্টি করে মানুষই। এই ভাষাগুলি শেখা, বোঝা ও ব্যবহার করা প্রযুক্তিবিদ্ থেকে প্রযুক্তি-ব্যবহারকারী সকলেরই কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের এই প্রযুক্তির যুগে। স্মার্ট ফোন থেকে মোটরগাড়ি সবকিছু চালানো যেমন নির্ভর করে যথাযথ প্রযুক্তি-ভাষা বাইরে থেকে জানা— এগুলির ভেতরের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে-জানতে হবে ব্যবহৃত প্রযুক্তির পরিচয়। সংকেত বা নকশা। সে ভাষা আরও উচ্চস্তরের। প্রযুক্তির রাসায়নিক যুগে যে গুরুত্ব পেল ফর্মুলা, সমীকরণ। ইলেক্ট্রিক্যাল যুগে সে জায়গা নিল সার্কিট। এসব প্রযুক্তি-ভাষা ছাপিয়ে — আজকের কম্পিউটার বা ইন্টারনেট যুগের জনপ্রিয় প্রযুক্তি-ভাষা— সি, জাভা, পাইথন ইত্যাদি। এসব শেখার জন্য আজ তাই বিশ্বজোড়া তোড়জোড়। সবরকম যন্ত্রের সফটওয়্যার মানে এর ভাষারই সংকেত বা সংখ্যার সমাবেশ। ইন্টারনেটও চলছে, বেড়ে উঠছে প্রযুক্তি-ভাষার বিশ্বজোড়া কর্মকাণ্ডে বা বিস্তৃতিতে। গাণিতিক ভাষা যেমন— কয়েকশ বছর ধরে বিজ্ঞানের বিন্যাসে ভূমিকা রাখছে, প্রযুক্তির নিজস্ব ভাষাও আজ প্রযুক্তি-চালিত সমাজ-সভ্যতার এক ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই ভাষার চর্চা যতই বাড়ুক, একে প্রযুক্তির ভাষা হিসেবে কজনই বা ভাবি? এই ভাষাকে আলাদা করে জানা-বোঝার একটা প্রচেষ্টা ছোট বয়স থেকে শুরু করা যায় না? এখন একেবারে বিশেষ বিশেষ 'উৎপাদন' বা 'ব্যবসা-বাণিজ্য' যেভাবে বিশেষ প্রযুক্তি-ভাষা বিশেষ শেখার 'হাওয়া' ছড়িয়ে দেয়, তা পেরিয়ে শিক্ষার নানা স্তরে, নানাভাবে বিজ্ঞানের সংস্কৃতির পাশাপাশি প্রযুক্তির ভাষাকে গুরুত্ব দিলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যথাযথ মেলবন্ধনে ভবিষ্যত সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে। এই প্রযুক্তি-ভাষার চর্চা মানে শুধু কমপিউটার ভাষা নয়— প্রয়োজনীয় সব প্রযুক্তিরই সব ভাষার কথা বলছি। যে সব ভাষায় আধুনিক সমাজের ব্যবহার্য সব যন্ত্র বা ব্যবস্থার গঠন, চলন, বলন!

উমা

যদি কিছু আমারে শুধাও ...

ভূপতি চক্রবর্তী

সত্যিই তো, কী করবো? নীরবে চাহিয়া রব কি? মনে হয় না। বরং ছুঁড়ে আর একটি প্রশ্ন, আমিও শুধাবো তোমারে, আর তাহলেই তো আমার উত্তর দেওয়ার দায় শেষ, তাই না? ইঁটের বদলে পাটকেল, আবার ইঁট, আবার পাটকেল। প্রশ্নের ঢেউ চলবে উত্তর মিলবে না। রাজনৈতিক আলোচনায় এখন প্রায় রোজকার সন্ধ্যাবেলায় কতগুলি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে আমাদের এমনটাই অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

জ্ঞানচর্চার তথা জ্ঞানের প্রসারের জন্য প্রশ্ন তোলা একেবারে প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু সেই প্রশ্নের লক্ষ্য যদি হয় কেবল প্রতিপক্ষকে জব্দ করা তাহলে সেই প্রশ্ন বোধহয় কাউকেই ঋদ্ধ করে না।

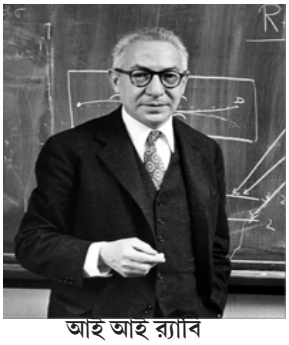

আই আই র‍্যাবি

অথচ, রাজনীতিতে সম্ভবত প্রশ্ন তোলাটাই বড় কথা, উত্তরের সন্ধান খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় সেখানে। তাই প্রশ্নের বদলে উঠে আসে প্রশ্ন, শ্রোতা টের পেয়ে যান যে ঐসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পথের রাজনীতির লোকেরা সচরাচর হাঁটবেন না। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়, যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা এক মোক্ষম জাঁদরেল প্রশ্ন? নাকি এই প্রশ্নগুলির লক্ষ্যই হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা? পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মাঝে মাঝে এমন মেলে বৈকি তৈরি ক্লাসের সব ছাত্রই যাতে কুপোকাত এমন প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষক হয়ত এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, ছাত্রদের একেবারে বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু সেই প্রশ্ন কি খুব ভালো প্রশ্ন? ছাত্ররা তার মধ্যে দিয়ে সর্বদা কি নতুন কিছু শেখে?

হ্যাঁ প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'ভালো' বিশেষণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব রকমের প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় না, তার জন্য চাই ভালো প্রশ্ন। কেউ হয়ত বা বলবেন, নিয়ে এসো তোমার প্রশ্ন; ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেন, এনে ফেলো একবার। গুগুল্ সাহেব তো বসে রয়েছেন উত্তর নিয়ে। বলো কী চাই তোমার! প্রশ্ন নিয়ে না ভেবে গুগুল্ করো। যে কোনো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। হ্যাঁ গুগুল্ এখন ক্রিয়াপদে পরিণত হয়েছে। She is googling for her studies, আপাতদৃষ্টিতে মন্দ নয়। কিন্তু ...

এই দ্বিধা প্রকাশ করার আগে উচিত হবে একটা কাহিনী উল্লেখ করা। গল্প নয়, কাহিনী। নিউইয়র্ক শহরের এক স্কুলছাত্র রয়েছে এই কাহিনীর কেন্দ্রে, তবে ঘটনাটি এখনকার নয়, গত শতকের প্রথম দশক হচ্ছে এই কাহিনীর সময়কাল। নিউইয়র্কের স্বচ্ছল ও শিক্ষিত ইহুদি গোষ্ঠীর একটি পরিবারের এই বালকটি আর দশটি ছাত্রের মতোই স্কুলে যেত, ক্লাস করত, খেলা করত। সেই সময়কার নিউইয়র্কের এই সমস্ত ইহুদি সমাজ তাদের অল্পবয়সী সদস্যদের শিক্ষার ও বিকাশের বিষয়টিতে কেবল মনোযোগী ছিল না, সেটি খুবই গুরুত্ব দিয়ে তারা বিশেষ করে প্রায় প্রতিটি শিশুর মা তাদের পড়াশোনার বিষয়টি খুব যত্ন সহকারে লক্ষ্য রাখতেন। তা, যে শিশুটির কথা আমরা পরবর্তীকালে তারই লেখা এবং বলা কিছু উপাদানের ওপর ভিত্তি করে লিখছি, সেই শিশুটিও বাড়ি ফিরে মায়ের মুখোমুখি হত এবং একটি প্রশ্ন সর্বদা তার মা তার জন্য বরাদ্দ রাখতেন। এই পর্যন্ত বলে যদি আমি কাউকে বলি, যে ছেলেটির মায়ের প্রশ্নটি অনুমান করার চেষ্টা করুন, তাহলে অনেকেই হয়ত তা বলতে পারবেন না বা অনুমান করতে পারবেন না; কি ছিল সেই প্রশ্ন। বিশেষ করে আজকের দিনের স্কুলফেরত ঐরকম একটি শিশু ও তার মায়ের মধ্যেকার যে কথোপকথনের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার ভিত্তিতে যদি চেষ্টা করি ভাবতে কী ছিল সেই প্রশ্ন, খুব বেশি মানুষ হয়ত সেই উত্তর নামক প্রশ্নটি খুঁজে পাবেন না। তবে সমস্ত দোষ কেবল এই মায়েদের নয়— অন্য অনেক কারণ রয়েছে এর পেছনে।

ফিরে আসা যাক শিশুর প্রতি মায়ের সেই প্রশ্নে। মা তার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করতেন, "ইস্সি, আজ কি তুমি স্কুলে একটা ভালো প্রশ্ন করতে পেরেছো?" হ্যাঁ, এটাই ছিল ইসিডোরের

মায়ের প্রশ্ন। সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর বেরিয়েছে কিনা, শিক্ষিকা কি তোমাকে ফ্রাঞ্জের থেকে কম নম্বর দিয়েছেন কিনা কিংবা অটোর সঙ্গে তোমার আর মারামারি হয়নি তো, জাতীয় প্রশ্ন এটি নয়। সচরাচর অন্য মায়েদের করা প্রশ্ন ''আজ স্কুলে কি শিখলি বা কি হল''। অথবা ''ঠিকঠাক টিফিন খেয়েছিলি তো'' এমন পরিচিত প্রশ্নের থেকেও এই প্রশ্ন ছিল আলাদা। মায়ের আদরের 'ইস্সি' পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছেন ইসিডোর আইজ্যাক র‍্যাবি বা আই আই র‍্যাবি (I.I. Rabi) নামে, পদার্থবিদ হিসেবে ১৯৪৪ সালে ভূষিত হয়েছেন নোবেল পুরস্কারে। তিনি তাঁর ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে শুনিয়েছেন এই কাহিনী : যেখানে একজন মা তার স্কুলছাত্র সন্তানকে উৎসাহ দেন ভালো প্রশ্ন করতে। লক্ষ্য করুন, ভালো উত্তর দিতে নয়। ভালো প্রশ্ন আদতে কী? তা কি এতটাই কঠিন?

মানতেই হবে, ভালো প্রশ্ন নিছক প্রশ্নের দৃষ্টিকোণ থেকেই খুব সহজ নয় অথচ ভালো প্রশ্নের উত্তর ক্ষেত্রবিশেষে বেশ সহজ-সরলও হতে পারে। তবে তা গতানুগতিক হলে চলবে না। যেমন র‍্যাবি জানিয়েছেন যে ভালো প্রশ্ন করার জন্য তার মায়ের এই বিশেষ উৎসাহদান তাকে বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ঐ ইহুদি সমাজের বহু মানুষ জীবনে কৃতী হয়েছেন অধিকাংশই মূলত বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি শাখায়। তাদের কৃতিত্বকে খাটো না করে বলা যায় যে, তারা ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে এসে মায়েদের কাছে যে প্রশ্নটি শুনেছেন তা মোটামুটি এইরকম— 'তুমি আজ স্কুলে কী শিখলে?' সন্দেহ নেই, এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে অধিকাংশ অভিভাবকের মনোযোগ এবং স্নেহ প্রকাশ পায় কিন্তু র‍্যাবির মতে তা সম্ভবত বহু ক্ষেত্রে সাফল্য এনে দিলেও বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ভিন্ন প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নকে সম্বল করেই তো বিজ্ঞানের পথচলা। ভালো প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে মেলে না বা যেটা মেলে তা বিজ্ঞানী-মনকে সন্তুষ্ট করে না।

ইসিডোর আইজ্যাক র‍্যাবি সম্পর্কে কেবল নোবেলজয়ী পদার্থবিদ বলাটা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ১৯৪৪ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পান নিউক্লিয়াল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স (Nuclear Magnetic Resonance) আবিষ্কারের জন্য। এই বিশেষ আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের হাতে একদিকে তুলে দিয়েছে যে নীতি তা অজস্র রাসায়নিক অণুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের এক উপায়। অন্যদিকে চিকিৎসাক্ষেত্রে এই নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে এম আর আই (MRI) বা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং-এর প্রক্রিয়া। এম আর আই সম্পর্কে আমাদের পরিচিতি বা তার তার প্রয়োগ এতটাই চেনা যে সেই বিষয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এছাড়া তার গবেষণার কাজ ব্যবহৃত হয়েছে মাইক্রোওয়েভ র‍্যাডার ও মাইক্রোওয়েভ আভেনের উদ্ভাবনায়। পরবর্তীকালে Counseil Europeen pour la Recherchi Nucleaire যা এখন আমাদের পরিচিত CERN নামে, সেটি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ এসেছিল র‍্যাবির কাছ থেকেই ১৯৫২ সালে যখন এগারোটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে CERN গড়ে তুলবার প্রয়াস নেন। বিজ্ঞান গবেষণায় বহুদেশের সম্মিলিত প্রয়াসের; বিশেষ করে বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহুদেশের অর্থ ও বৌদ্ধিক অবদানের ক্ষেত্রে CERN এক অনন্য মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। ১৯৮৮ সালে প্রয়াত আই আই র‍্যাবিকে তাঁর জীবনের শেষদিকে চিকিৎসার জন্য এম আর আই করতে হয়। ঐ যন্ত্রে যখন র‍্যাবিকে শুইয়ে এক শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় তখন তাঁর এক ভয়ের অনুভূতি হয়েছিল। বক্রতল বিশিষ্ট দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী। এম আর আই-এর তখন শৈশবাবস্থা কিন্তু র‍্যাবি তারপর আনন্দ পেয়েছিলেন, বলেছিলেন তার করা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে নীতির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসাবিদ্যায় উঠে এসেছে নতুন হাতিয়ার। মানবকল্যাণে যার ব্যবহার হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ।

র‍্যাবি তো অবশ্যই অনুভব করেছিলেন তার জীবনে ভালো প্রশ্ন উত্থাপনের ভূমিকা। তবে তিনি একা নন, দেখা গেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভালো প্রশ্নের মূল্য ও ভূমিকা হতে পারে সুদূরপ্রসারী। একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। ১৬৬৫ সালে লন্ডনের প্লেগের অতিমারী থেকে বাঁচতে উলসথর্প গ্রামে দিদিমার বাড়িতে আটকে যাওয়া কেমব্রিজের ছাত্র তেইশ বছরের আইজাক নিউটনের মনেও এসেছিল একটা ভালো প্রশ্ন। আপেল গাছ ছিল কিনা, সেখান থেকে আপেল পড়েছিল কিনা তা নিয়ে যে বিতর্ক চালু আছে তাতে একেবারেই মন না দিয়ে বলা যায় তেইশ বছরের আইজাক ঐ প্রশ্নটা নিজেকেই করে ফেলেছিলেন। কেন সবকিছু পৃথিবীর দিকে নেমে আসে— যেমন পতন একেবারে সরাসরি তা ওপরের দিকে উঠে যায় না, তেমনই দৌড় লাগায় না থামে। আবার কোপারনিকাসের অনুসারী হয়ে উঠে আসে সেই প্রশ্নও; সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত এই পৃথিবী কীভাবে টিকে থাকে তার

কক্ষপথে, কেনই বা সে ছুটে যায় না সূর্যের দিকে? কেনই বা সে ঝাঁপ দেয় না ঐ অগ্নিগোলকের বৃহৎ কুণ্ডে?

ঐ ভালো প্রশ্নের উত্তর খুঁজেই নিউটন দিয়েছিলেন তাঁর সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র। এই বিশ্ব তথা সৌরজগতের আচার আচরণ বুঝতে তা এক চমৎকার পথ। তবে আইনস্টাইন সাহেবের মাথায় এল আর একটি ভালো প্রশ্ন, যা সংশয় তুলে দিল মহাকর্ষের প্রকৃত চরিত্র নিয়ে। প্রশ্নটা হয়ত ততটা গুরুত্ব পেত না, কিন্তু ততদিনে প্রযুক্তিবিদেরা তৈরি করে ফেলেছেন এমন সব যন্ত্র যা দিয়ে সূক্ষ্মতর পরিমাপ করা যায়, ধরা পড়ে এমন বহু পরিঘটনা যা আগে সম্ভব ছিল না। আর এই ভালো প্রশ্নের ধাপগুলি অতিক্রম করে তার উত্তর প্রাণপণ খুঁজে বিজ্ঞান সদর্থক দিকে তার পরবর্তী পদক্ষেপটি নেয়। যেমন এক্ষেত্রে জানা যায় যে, মহাকর্ষের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে গেলে তাকে দেখতে হবে দেশকালের বক্রতা হিসেবে। তবে একটি ভালো প্রশ্নের উত্তর খুঁজেই বিজ্ঞানের ঝাঁপ বন্ধ হয় না। সেখানে উঠে আসে নতুন ভালো প্রশ্ন, শুরু হয় তার উত্তরের সন্ধান। আক্ষরিক অর্থেই প্রশ্নের ঢেউ সেখানে আসতেই থাকে, আর এটাই তো বিজ্ঞানের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য।

আসলে প্রশ্নের উত্তর এখন সকলেই দিতে ব্যস্ত, কারণ গুগুল্ সাহেব আমাদের পকেটে হাজির। দুপুরের দিকে কলকাতা থেকে বেরিয়ে বোলপুর পৌঁছতে কতটা সময় লাগবে বা জনপ্রিয় চিত্রতারকার প্রথম স্ত্রীর নাম কি, বা লতা মঙ্গেশকর ঐ যে গানটা গেয়েছিলেন তা কোন সিনেমার এইসব অসংখ্য, অজস্র ধরনের প্রশ্নের উত্তরের জন্য গুগুল্ সাহেবের হাত সর্বদা প্রসারিত এবং সার্ভিসও বেশ দ্রুত। তবে যেসব জায়গায় 'নেট কানেকশন' দুর্বল সেখানে গুগুল্ সাহেবের প্রতাপ মার খেয়ে যায়।

এই ধরনের প্রশ্নের যে উত্তর গুগুল্ সাহেব দিচ্ছেন তার প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো জায়গা নেই। জ্ঞানের সমবন্টন বা এক ধরনের সর্বজনীনতার দিকে পা রাখাতে গুগুল্ বা অন্য সার্চ ইঞ্জিন যে ভূমিকা নিয়েছে তা কল্পবিজ্ঞানকে হার মানায়। তাই একেবারে হাঁটুর বয়সীকে প্রশ্ন করা যায় ১৯১০ সালের ফিজিক্সের নোবেল প্রাইজ কে পেয়েছিলেন কিংবা তার থেকে জেনে নেওয়া যায় যে এইমাত্র ডাক্তারবাবু যে খটমট রোগটির নাম করলেন তা আসলে ঠিক কী। গুগুল্ ব্যবস্থায় ছাত্র শিক্ষকের ভূমিকা উল্টে যাচ্ছে, বাবা শিখছেন ছেলের কাছে, কোন্ বিষয় বা ভাষা গুগুলের অজানা? সত্যিই বিস্ময়কর।

তবে আপনি গুগুল্‌কে বোকা বানাতে পারেন। আজ থেকে ধরা যাক চল্লিশ বছর আগে আপনি যাদের সঙ্গে ক্লাস নাইনে পড়তেন, স্কুলের নাম দিয়ে সার্চ দিলে সেই তালিকা আপনি পাবেন না। পাবেন না পরিবারের ঊর্ধতন ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষের নাম। কিংবা গত শতাব্দীর নয়ের দশকে কলকাতার লীগে মোহনবাগানের সঙ্গে উয়াড়ির যে ম্যাচটি হয়েছিল, যেটি আপনিই দেখেছিলেন গ্যালারিতে বসে, সেই ম্যাচটিতে যাঁরা খেলেছিলেন মোহনবাগানের হয়ে তাঁদের নামগুলি। আজ যে রেস্তোঁরা থেকে আপনার খাবার এসেছে সেখানকার পাচকের নাম। আসলে যে তথ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে নেই, যে তথ্য সেখানে সরবরাহ করা হয় নি তার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করলে গুগুল্ সাহেব হাত তুলে দেন। কারণ তিনি কেবল তার ভাঁড়ারে থাকা তথ্যের সুলুক সন্ধান দিতে পারেন, তার বাইরে গুগুলের রাজত্ব শেষ।

বিজ্ঞানের ভালো প্রশ্নের উত্তর তো আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে মজুত নেই, তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আর এই খোঁজার নাম গবেষণা। প্রশ্ন ভালো হলে তবেই তার উত্তরের সন্ধানে অর্থপূর্ণ গবেষণা হতে পারে। অনেক প্রশ্নের উত্তর একটা পুরো জীবন গবেষণাগারে কাটিয়েও জানা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে সেই গবেষণাও আলোকপাত করেছে সত্যানুসন্ধানের রাস্তায়। উত্তরসূরী বিনম্রভাবে তা গ্রহণ করে শুরু করেন নিজের যাত্রা। রাজনীতির মানুষদের মতো তিনি বলেন না, উনি তো পারলেন না, আমাকে সুযোগ দিন, করে দেখিয়ে দেব।

লোকচক্ষুর আড়ালে বহু বিজ্ঞান গবেষক ভালো প্রশ্ন তুলে এগিয়ে চলেছেন উত্তরের খোঁজে। মাঝে মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কখনও ভ্যাকসিন, কখনও বা আরও কাজের মোবাইল ফোন অথবা কোনো জটিল রোগের ওষুধ। দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ভালো প্রশ্ন পাওয়া গেলে মন্দ হয় না। আমরা সকলেই তাহলে হয়ত আরো একটু চিন্তাভাবনা করব। বিশেষ করে আজকের ছোটরা বিনা প্রশ্নে কোনো কিছু গ্রহণ করার অভ্যাস ত্যাগ করলে ভালো প্রশ্ন হয়ত বা বৃদ্ধি পেতে পারে। আর তাই ভালো প্রশ্নের বিকল্প নেই।

সাহায্যসূত্র :

1. Article published in New York Times of January 19, 1988 after the demise of I.I. Rabi https://www.nytimes. com/1988/01/19/opinion/I-izzy-did-you-ask-a-good-question-today-712388. html

2. "How I won the Nobel Prize" https://lectiotube.com/2020/10/19isidor-issac-rabi-nobel-prize-in-physics.

3.For quotation by I.I.rabi https:en.wikiquote.org/wiki/Isidor Issack Rabi

উমা

পর্ব — ২

স্বচিকিৎসা — নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করুন

গৌতম মিস্ত্রী

ডায়াবেটিস, যাকে বাংলায় মধুমেহ রোগ বলে, আজকাল ঘরে ঘরে। রক্তে শর্করা, গোদা বাংলায় বললে চিনির পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই এই রোগের দস্তুর। যার রাশ টানতে না পারলে হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক, চোখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হয়ে যেতে পারে। এই রোগে নিয়মিত রক্তপরীক্ষা জরুরি। এখন পাড়ায় পাড়ায় প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। এমনিতে অসুবিধে নেই। তবে যারা রোগাক্রান্ত তারা রক্তপরীক্ষার ব্যাপারটা ঘরে বসেই সেরে ফেলতে পারেন। তা নিয়েই দু চার কথা এই প্রতিবেদনে।

প্রস্তাবনা

গ্রামেগঞ্জে না মিললেও শহরে ওষুধের দোকানে দু-আড়াই হাজার টাকায় রক্তের সুগার মাপার নির্ভরযোগ্য যন্ত্র, যার চলতি নাম 'গ্লুকোমিটার' কিনতে পাওয়া যায়। এককভাবে কিনতে না চাইলে, পাড়া বা ক্লাবের সদস্যরা চাঁদা তুলেও কিনতে পারেন। এটা দিয়ে ঘরে বসেই সস্তায় নির্ভরযোগ্যভাবে রক্তে শর্করা নির্ণয় করা যায়। প্রতিটা পরীক্ষার জন্য একটি করে রাসায়নিক মাখানো প্লাস্টিকের পাতা (স্ট্রিপ) লাগে, যার প্রতিটার দাম ২০-২৫ টাকা। রক্তশর্করা মাপতে এক ফোঁটা রক্তই যথেষ্ট। যার জন্য পিন (ল্যান্সেট) বা ইনজেকশনের সূঁচ লাগে। একটা প্যাকেটে বা শিশিতে ১০, ১৫ বা ৫০ টেস্ট স্ট্রিপ থাকে। প্যাকেট খুললে মোটামুটি তিনমাসের মধ্যে ব্যবহার করে নিতে হয়। কারণ, বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প টেস্ট স্ট্রিপকে অকেজো করে দিতে পারে। ল্যাবরেটরিতে সুগার পরীক্ষার জন্য ৭০ থেকে ১৫০ টাকা লাগে, সঙ্গে বাড়ি থেকে ল্যাবরেটরিতে বার দুই যাওয়া-আসার খরচ। ডায়াবেটিস রুগীদের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরির রিপোর্টের চেয়ে বাড়িতে আঙ্গুলে পিন ফুটিয়ে রক্ত বের করে 'ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ (CBG)' বা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন যন্ত্রে মেপে নেওয়া বেশি কাজের বলে বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ হিসাবে জানাই— সুগার পরীক্ষার আগে দু-ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোলসা করে নেওয়া প্রয়োজন। খামোকা রক্তে সুগারের মাত্রা কেন জানতে চাইব? এটা ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের অঙ্গ। তবে জেনে রাখা জরুরি— ডায়াবেটিস আপাত সুস্থ মানুষের গ্লুকোমিটার দিয়ে নিজের রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা যথার্থ নয়। তাঁদের প্রথাগত ল্যাবরেটরির উপরে নির্ভর করতে হবে। ডিজিটাল গ্লুকোমিটারে পরীক্ষা কেবল ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সুগারের মাত্রা জেনে ডাক্তারকে ওষুধের অদলবদলে সাহায্য করে।

কারা 'ডিজিটাল' যন্ত্রে পরীক্ষা করবেন?

ঠিক চিকিৎসার ওষুধপত্র এবং ইনসুলিনের নির্বাচন ও তার মাত্রা নির্ধারণের জন্য ডায়াবেটিস আক্রান্তদের নিয়মিতভাবে জীবনভর এইযন্ত্রের সাহায্যে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা জেনে লিখে রাখতে হয়। এক-দুবার পরীক্ষার ব্যাপার হলে এর দরকার হত না। এটা উচ্চ রক্তচাপের রুগীর নিয়মিত রক্তচাপ মাপার সঙ্গে তুলনীয়। ঘরে বসে সুগার মেপে নেওয়াটা তাই সস্তা আর স্বস্তিরই নয়, বেশি কাজের।

গ্লুকোমিটারে নিজে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়

১) প্রথমে সাবান ও গরম জলে হাত ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। ২) আঙুলের ডগা থেকে রক্ত বের করার জন্য ফোঁটানোর যন্ত্র যেটা ল্যান্সিং ডিভাইস নামে পরিচিত, তাতে নতুন পিন বা ল্যান্সেট জুড়তে হবে। একটা পিন একই ব্যক্তি একাধিকবার ব্যবহার করতে পারেন। তবে বারবার ব্যবহারে পিনটি ভোঁতা হয়ে গিয়ে বেশি ব্যথা লাগে।

আঙুলের ডগার মাঝখানের চেয়ে ধারের দিকে কম স্নায়ু থাকায় ধারে পিন ফোটালে ব্যথা কম লাগবে। আঙুলের বদলে কবজির উপরে সামনের দিকেও পিন ফোটানো যায়। রক্ত বের করার জন্য জায়গাটাকে সাবান দিয়ে ধুয়ে, শুকিয়ে হাত

দিয়ে বারবার ঘষে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে নিতে হবে, যাতে পিনের আলতো খোঁচায় এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে। শীতকালে হাতের রক্তনালী সরু হয়ে যায়। প্রবীণদের অসুবিধা হয়। এমনটা হলে গরম জলে হাত ধুয়ে নিলে কাজটা সহজ হয়। ৩) বাজারে অজস্র গ্লুকোমিটার, তেমনি অজস্র টেস্ট স্ট্রিপের শিশি বিক্রি হয়। ছিপি একবার খুললে শিশির সমস্ত স্ট্রিপ দু বা তিন মাসের মধ্যেই ব্যবহার করে নিতে হবে। এটা ব্যবসায়িক চাল। প্রস্তুতকর্তারা চাইলেই এক একটা স্ট্রিপ আলাদাভাবে বায়ুনিরোধক প্যাকেটে ভরে বাজারে ছাড়তে পারেন। ৪) পিনের খোঁচায় রক্ত আঙুলের ডগায় বেরিয়ে এলে টেস্ট স্ট্রিপের রাসায়নিক মাখানো প্রান্ত সেই রক্তের ফোঁটায় স্পর্শ করালে কৈশিক আকর্ষণে (ক্যাপিলারি অ্যাকশনে) রক্ত স্ট্রিপে মিশে যাবে ও গ্লুকোজের মাত্র অনুযায়ী স্ট্রিপের রাসায়নিক প্রান্ত এক বিশেষ মাত্রার বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। ৫) এবার রক্তমাখানো স্ট্রিপ গ্লুকোমিটারের নির্দিষ্ট খোপে ঢোকালেই যন্ত্র গ্লুকোজের মাত্রা দেখিয়ে দেবে। এই মাত্রা, ব্যবহৃত সুগারের ওষুধের বিবরণ, তারিখ, সময়, না খেয়ে বা শেষ খাওয়ার কতক্ষণ পরে এই মাত্রা নির্ণীত হল, লিখে রাখতে হবে। ৬) দামি গ্লুকোমিটারে তথ্য জমা রাখার উপায় থাকে। তবুও কাগজে লিখে রাখা জরুরি।

গ্লুকোমিটারে বাড়িতে সুগার মাপা কতটা নির্ভরযোগ্য?

বাজারে যে গ্লুকোমিটার বিক্রি হয় সেগুলো ভরসাযোগ্য। দুটো যন্ত্রের ফলাফলেও তেমন পার্থক্য হয় না। যন্ত্রে অবিশ্বাস্য ফল দেখালে সেটা ভুল মনে করার কারণ নেই। প্রয়োজনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ল্যাবরেটরিতে শিরার রক্তের সুগারের মাত্রা জানা যায় আর গ্লুকোমিটারে ক্যাপিলারি। স্কুলে পড়া রক্তের প্রবাহপথ মনে করুন, দেখবেন রক্তজালিকায় শিরার থেকে খানিকটা বেশি গ্লুকোজ থাকা স্বাভাবিক। দুই পদ্ধতির ফলাফলে সুগারের মাত্রায় ১৫ শতাংশ ফারাক স্বাভাবিক। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কোনো শারীরিক সমস্যার কারণ নেই বটে, তবে অনেক কম হলে সাধারণত কিছু শারীরিক সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ শারীরিক সমস্যা নেই, তেমন ক্ষেত্রে গ্লুকোমিটারের পরীক্ষায় বেশ কম সুগারের মাত্রা নির্ণয় হলে ফের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেক কমে গেলে গ্লুকোমিটার ততটা নির্ভুলভাবে দেখাতে পারে না। মাঝে মধ্যে তাই ল্যাবরেটরিতে মাপার সময় সঙ্গে গ্লুকোমিটারটা নিয়ে গিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রবীণদের অনেক সময় দৃষ্টির সমস্যা থাকে। তাঁদের জন্য 'কথাবলা' গ্লুকোমিটার পাওয়া যায়। সেটা ফল দেখানোর সঙ্গে সংখ্যাটা বলেও দেয়।

কারা গ্লুকোমিটার ব্যবহার করবেন?

ডায়াবেটিস চিকিৎসার অন্যতম লক্ষ্য, রক্তে গ্লুকোজ স্বাস্থ্যকর মাত্রার মধ্যে রাখা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর খাবার, শরীরচর্চা ও ওষুধের মাধ্যমে জীবনভর গ্লুকোজের মাত্রা নির্দিষ্ট রাখা। চিকিৎসার জন্য সুগারের মাত্রা বারবার মাপতে হয়। হৃদরোগ, রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো কয়েকটা অনিরাময়যোগ্য 'ক্রনিক' রোগে ওষুধ নির্বাচনে আর তার মাত্রা নির্ধারণে কেবল একবার রক্তচাপ ও গ্লুকোজ ইত্যাদি মাপলেই চলে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে রোগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। তাছাড়া আমাদের খাদ্য নির্বাচনে, খাবার পরিমাণে, শরীরচর্চার ঘাটতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে একই ওষুধ খেয়ে গেলেও সুগারের মাত্রা একই থাকে না। আগে যে ওষুধে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর সীমার মধ্যেই ছিল, সেটা চুপিসারে শরীরকে কোনো ইঙ্গিত না দিয়েই বেড়ে গিয়ে গোপনে কিডনি, চোখ, স্নায়ু ইত্যাদির ক্ষতি করতে থাকে। ঘটনা হল, প্রাথমিক পর্যায়ে এই ক্ষতি টের পাওয়া যায় না। ৬০-৮০% ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর, যখন টের পাওয়া যায়, তখন বড় দেরি হয়ে যায়। তলায় তলায় বেড়ে গিয়ে ক্ষতি

ঠেকাতেই নিয়মিত রক্তের মাত্রা চিকিৎসককে জানাতে হয়। যাতে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তিনটি উপায় আছে— ১) প্রথাগত ল্যাবরেটরির রক্তপরীক্ষা, ২) গ্লুকোমিটারে ঘরে বসে পরীক্ষা আর ৩) শরীরে অস্ত্রোপচার করে ঢোকানো 'স্বয়ংক্রিয় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্তের গ্লুকোজ মাপার যন্ত্র'। শেষেরটা কেবল জ্ঞানের জন্য, যা আমাদের দেশে আপামর মানুষের ক্ষেত্রে মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়। এই যন্ত্রের ইংরেজি নাম 'কন্টেনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং' বা CGM। এতে রোগীর রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বাড়া কমার সঙ্গে যন্ত্র তার সঙ্গে থাকা ইনসুলিনের ভাঁড়ার থেকে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে। এটা পদ্ধতি হিসাবে ভাল। তবে আমাদের দেশে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ।

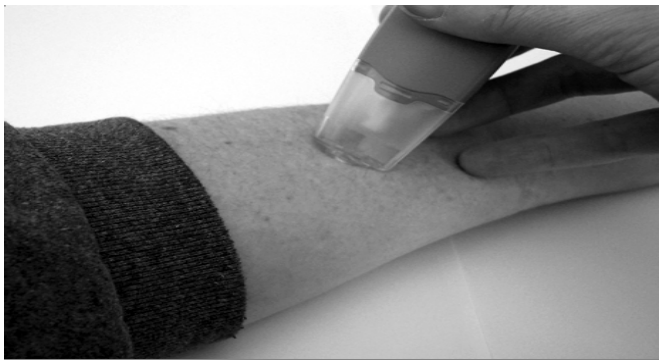

ডায়াবেটিসের রুগীর চিকিৎসার মূল্যায়নের আর একটি পরীক্ষা রক্তে গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিনের (HbA1c) মাত্রা নির্ধারণ। এই পরীক্ষা ডায়াবেটিস রোগীর সবচেয়ে উন্নত মূল্যায়ন তাঁর দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতার জন্য। তবে এটিও কিঞ্চিৎ জটিল। বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষাগারেই এই পরীক্ষা করা উচিত। এটা সস্তা নয়। এই পরীক্ষায় খালি পেট বা ভরা পেটের সমস্যা নেই। রক্তের গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ক্ষণিকের রক্তের অস্বাভাবিক উচ্চ বা নিম্ন মাত্রা প্রভাবিত করে না। বরং একটা গড় আভাস দেয়। এই পরীক্ষা যেদিন করা হচ্ছে, তার তিনমাসের আগের থেকে সেইদিন অবধি রক্তের গড় গ্লুকোজের মাত্রার আভাস দেয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্তের চোখ, কিডনি আর স্নায়ুর ক্ষতিসাধনের (Microvascular complication) ইঙ্গিত দেয়। যা থেকে চিকিৎসক ঠিক ওষুধের নিদান দিতে পারেন।

স্থানীয় পরীক্ষাগারে, ওষুধের দোকানে বা সাইকেলে চলমান দালালের মারফতে সহজেই রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা করে নেওয়া যায়— সেটাই জনপ্রিয় ও সস্তা। তবে এটা মনে রাখতে হবে, রক্তপরীক্ষা আপনার শরীরের যত্নের কর্মকাণ্ড। তাই এর সঙ্গে কোনো আপস নয়। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করুন, প্রয়োজনে একটু কষ্ট করে হলেও আপনার বিচারে শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাগারে যান।

ডায়াবেটিস হলে কত ঘন ঘন পরীক্ষা?

প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে অভুক্ত অবস্থায় ও খাবার পরে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের যত কাছাকাছি রাখতে পারবেন, তার চোখ, কিডনি আর স্নায়ু তত দীর্ঘদিন স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নিয়ে কাজ করবে। প্রতিদিন অন্তত দিনের পাঁচ-ছয় রকমের সময়ে গ্লুকোজের মাত্রা মাপা দরকার— সকালে অভুক্ত অবস্থায়, দুপুরে ও রাতে খাবার আগে আর সকালে, দুপুর আর রাতে খাবার দুই ঘণ্টা পরে রক্তের সুগারের মাত্রা আপনার ডাক্তার জানতে পারলে তিনি সবচেয়ে কার্যকরী নিদান দিতে পারেন। তবে ৩৬৫ দিন রোজ পাঁচ-ছয়বার আঙুল ফুটিয়ে রক্ত বার করে তার গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করে সেটা তার ডায়েরিতে লিখে রাখবেন এমন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষ পাওয়া ভার। তাই একটা আপস করতেই হয়। সেটা চিকিৎসক যেমন বলবেন, সেটা করাই ভালো। গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিন, বা ছোট করে বললে, গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA1c) পরীক্ষা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা মূল্যায়নের একটা পরিপূরক পরীক্ষা, বিকল্প নয়।

টাইপ ১, মানে ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিসের আলোচনা ক্ষণিকের জন্য মুলতুবি রেখে টাইপ ২, অর্থাৎ ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ সুগারের রোগীর কথা ভাবা যাক। ইনসুলিন অনির্ভর, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীর চিকিৎসার মূল্যায়নের জন্য কত ঘন ঘন রক্তের সুগারের, অর্থাৎ গ্লুকোজের মাত্রা মাপতে হবে সেটা রুগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য — কেবল সুগারের ট্যাবলেটেই চিকিৎসা করা যাচ্ছে না ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হচ্ছে, তাঁর জীবনশৈলী, গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিনের মাত্রা আর রক্তের সুগার কমে গিয়ে আতঙ্কের

'হাইপোগ্লাইসেমিয়া' নামের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কিনা সেটা বিবেচনা করে চিকিৎসক কত ঘন ঘন রক্তের সুগার মাপতে হবে সেটা বলে দেন। উন্নত দেশে রোগী প্রতিদিন চারবার করে গ্লুকোজের মাত্রা ঘরে বসে মেপে ডায়েরিতে লিখে রাখেন। আমাদের দেশে চিকিৎসক রোগীর সচেতনতা আর সামর্থ্য বিচার করে একজন স্থিতিশীল ডায়াবেটিসে রোগীকে সপ্তাহে ছ'বার সুগারের পরীক্ষা করতে — প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন আর রাতের খাবারের আগে ও এই তিন ভোজনের দুই ঘণ্টা পরে রক্ত পরীক্ষা করতে বলতে পারেন। এটা একই দিনে না হলেও চলবে। আপস করতে হলে প্রতি সপ্তাহে না করতে পারলে প্রতি পক্ষে অন্তত অথবা প্রতি মাসে করতে হবে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া: ডায়াবেটিস রুগীর সুগারের মাত্রা হঠাৎ স্বাভাবিক সীমার নীচে নেমে বিপত্তি ঘটায়। যাকে বলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। এতে অনেক সময় রোগীর প্রায় যমের মুখ থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতাও হয়। এই অবস্থা ঠেকাতে চিকিৎসকেরা সচেতনতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর জোর দেন। বলেন — বেশি পরিমাণের অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়ানোর মতো অত্যন্ত প্রয়োজন সময়মতো ন্যূনতম খাবার গ্রহণ করা দরকার। কোনও অজুহাতে খাবার সময় পিছানো চলবে না বা প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণের খাবার খাওয়া চলবে না। সুস্থ মানুষের রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখার যে জৈবিক ক্রিয়া সক্রিয় থাকে সেটা ডায়াবেটিসের রুগীর ক্ষেত্রে বিকল থাকে। তাই রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখার জন্য আক্রান্ত মানুষের জন্য সচেতনে ওষুধ ব্যবহারের সাথে সাথে সময়মতো সঠিক পরিমাণের খাবার খাওয়ার জন্য আলাদা করে মাথা খাটাতে হয়। যে ডায়াবেটিসের রুগী এক বা একাধিকবার দুঃস্বপ্নসম রক্তের সুগারের মাত্রা কমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর ক্ষেত্রে গ্লুকোমিটার দিয়ে ঘন ঘন নিজের সুগারের মাত্রা মেপে সেটা লিখে রাখা জরুরি। তারিখ, সময়, অভুক্ত বা খাবার কত সময় পরে সেটা মাপা হল আর সেই সময়ে সুগারের কোন কোন ওষুধ কত মাত্রায় চালু আছে সেটা লিখে রাখবেন। এই তথ্য চিকিৎসক ব্যবহার করে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সম্ভাবনা দূর করে আরও নিখুঁত নিদান দিতে পারবেন।

ইনস্যুলিন না ওষুধ, কোনটার খরচ কম: ডায়াবেটিস রোগের তীব্রতা বয়সের সঙ্গে বাড়তেই থাকে। নিয়মিত শরীরচর্চা না করলে, খাদ্যশৃঙ্খলা না মেনে চললে রোগের শুরুর বেশ কয়েক বছর পরে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর একটা কারণ হয়ত, আজকাল, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী আগের জমানার চেয়ে অনেকদিন বেশি বাঁচেন। রোগ পুরনো হলে এক সময় ওষুধের মাত্রা বাড়ানো আর নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের প্রয়োগ এবং/অথবা ইনস্যুলিন ইনজেকশনের ব্যবহার করতেই হয়। দামের দিক দিয়ে ডায়াবেটিসের নতুন ওষুধগুলো বেশ খরচের, অনেক সময় ইনস্যুলিনের চেয়েও দামি। এক্ষেত্রে রোগীর ক্রয়ক্ষমতা আর ইনজেকশনে অনীহার মধ্যে একটা আপস করা যায় কিছুকাল পর্যন্ত। এক সময় ইনস্যুলিন ছাড়া চলে না, যেমন কিডনির অসুখ শুরু হয়ে গেলে।

ইনস্যুলিনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে, ওষুধে উল্টো: এই প্রশ্নের উত্তর কিঞ্চিৎ জটিল। পরিণত বয়সের ডায়াবেটিসে বেশ কিছু ওষুধ ইনসুলিনের চেয়ে বেশি উপকারী, যেমন, মেটাফরমিন। টাইপ -২, অর্থাৎ পরিণত বয়সের যে ডায়াবেটিস রোগ, যেটা মোট ডায়াবেটিস রোগের ৯৫ শতাংশের বেশি, তাতে প্রাকৃতিকভাবে শরীরে প্রস্তুত ইনস্যুলিন (যেটা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশিও হতে পারে, hyperinsulinaemia), তার কর্মক্ষমতা হারায় ইনস্যুলিনে সংবেদনতার অভাবে। মেটফরমিন নামের পুরনো ও সস্তা ডায়াবেটিসের ওষুধটি দেহকোষে রোগীর শরীরে উপলব্ধ ইনস্যুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়ায়, অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে ও প্রামাণ্যভাবেও ইনস্যুলিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আবার ডায়াবেটিসের সাথে হার্ট ফেলিওর (হৃদস্পন্দনে রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা হ্রাস পেলে) SGL2 inhibotors (empaglifazone, Dapagligazone) বিশেষ কাজের, যেটা ইনসুলিন করতে পারে না। **উ মা**

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

সাধারণ ডাকযোগে কেউ কেউ পত্রিকা পান না বলে অভিযোগ জানান। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ ডাকবিভাগের ওপর আমাদের ভরসা করতে হয়। পত্রিকা না পেলে দ্বিতীয়বার আবার ডাকযোগে আমাদের পক্ষে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের ওয়েবসাইটে পত্রিকা দেখে নেবেন।

ভ্যাক্সিনের অন্তরালে

অরুণালোক ভট্টাচার্য

ইংল্যান্ডের শেরবোর্ন শহরের ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইয়েটমিন্সটার — একটি ছোট্ট গ্রাম। অষ্টাদশ শতকের শান্ত জীবনযাত্রায়, সেখানকার মানুষদের একমাত্র অশান্তি ছিল গুটি বসন্ত বা স্মল পক্সের উপদ্রব। বাড়াবাড়ি হলে একশ জনের মধ্যে তিরিশ জনের মৃত্যু অনিবার্য। যাঁরা বাঁচলেন, তাঁদের শরীরে করাল-চিহ্ন থেকে যেত জীবনভর। এরই মধ্যে বেঞ্জামিন জেস্টি নামে ঐ গ্রামেরই এক গবাদি পশুপালনকারী একটু অন্যরকম ভাবনা ভাবলেন। তিনি খেয়াল করলেন যে, যেসব গোয়ালিনিরা গো-বসন্ত বা কাউ পক্স রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা গুটি বসন্তের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। এই পর্যবেক্ষণ তাঁকে এক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ভাবনায় ঋদ্ধ করল। অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর রোগাক্রান্তরা বড় রোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন— জেস্টির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। মোহাবিষ্টের মতো তিনি তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রসন্তানকে নিয়ে চললেন দুই মাইল দূরে এক নির্জন জায়গায়। সেখানে গো-বসন্ত আক্রান্ত গবাদি পশুগুলিকে আলাদা করে রাখা ছিল। পশুগুলিকে পরিচর্যা করার ছলে তাঁরা সকলেই গো-বসন্ত রোগে স্বেচ্ছাক্রান্ত হলেন। নিজের নিকটজনদের ইচ্ছাকৃতভাবে পশু রোগে আক্রান্ত করার জন্য প্রতিবেশী-পরিজনরা গঞ্জনার ঝড় তুললেন। মরমে মরে গিয়ে জেস্টি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। পৃথিবীর কেউ জানতেই পারল না, তাঁর সন্তানেরা দীর্ঘ পনেরো বছর গুটি বসন্তের কবল থেকে বেঁচে গেল। তাঁর ভাবনা সমালোচনার চাপে মাথা তুলতেই পারল না। তাঁর দর্শন মান্যতা পেল তিরিশ বছর পরে। এডোয়ার্ড জেনার ঐ দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ১৭৯৮ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর Variole vaccine লেখা। জন্ম নিল মানব জীবনের বেঁচে থাকার এক অপূর্ব জিয়ন-কাঠি। ভ্যাক্সিনের জনক হিসাবে এডোয়ার্ড জেনার সাহেবের নামের বর্ণবলয়ে হারিয়ে গেলেন বেঞ্জামিন জেস্টি।

এর প্রায় একশ বছর পরের ঘটনা। লুই পাস্তুর দেখলেন যে মুরগির কলেরা-ব্যক্টেরিয়া সম্বলিত একটি মাধ্যম কোনও কারণে তার সংক্রমণের ঝাঁঝ হারিয়ে ফেললেও, সেটি মুরগির শরীরে ঢুকে তাকে কলেরা রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। তার মানে শুধু রোগ নয়, রোগের নির্বিষ জীবাণুও ভ্যাক্সিন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। বিষে বিষক্ষয়ের এই দর্শন আমরা সপ্তম শতকের ভারতীয় বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যেও পেয়েছি। তাঁরা পরিমিত মাপে সাপের বিষ পান করতেন সর্পদংশনের হাত থেকে বাঁচার জন্য। লুই পাস্তুর হলেন প্রথম জীববিদ যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে মানুষ ভ্যাক্সিন তৈরি করতে পারে তার সুবিধামতো এবং পছন্দমতো। বিশ্বের দরবারে আরেক নতুন বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা ঘটল।

এর পরে ভ্যাক্সিনের যাত্রা শুধুই উত্তরণের। একটি জীবাণু বিভিন্নরকম গঠনকারী অংশকে নিয়ে তৈরি হতে থাকল এক-একটা ভ্যাক্সিন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি ব্যক্টেরিয়া বা ভাইরাস। জীবন্ত জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে ভ্যাক্সিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় যক্ষ্মা, পোলিও, হাম ইত্যাদি রোগের জন্য। মৃত জীবাণুকে কাজে লাগিয়ে হুপিং কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জলাতঙ্ক বা রেবিস রোগের ভ্যাক্সিন তৈরি হল। জীবাণু প্রোটিন এককভাবে বা অন্য কোনও প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভ্যাক্সিনের আরেকটি শাখা বিস্তার করল। চলতি টিটেনাস টক্সয়েড বা ডিপথেরিয়া টক্সয়েড বা নিউমোকক্কাল বা মেনিংগোকক্কাল ভ্যাক্সিন এই গোত্রের। বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগোলেন। জীবাণুর ডি.এন.এ বা আর.এন.এ নিয়ে প্রযুক্তির সাহায্যে সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিন তৈরি করে ফেলা হল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হেপাটাইটিস বি বা একদম হালফিলের কোভিড ভ্যাক্সিন। ভ্যাক্সিনের এই বিবর্তন কিন্তু খুব সহজ রাস্তায় আসে নি। ওষুধের দ্বারা রোগ নিরাময়ের ধারণা থেকে, ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের এই যে ভাবনার পরিবর্তন, এটা স্বাভাবিক নিয়মেই সর্বজনগ্রাহ্য হতে সময় লেগেছে। অনেক মানুষকে অসুস্থ হতে হয়েছে, পঙ্গু হতে হয়েছে, এমনকি মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মানব সভ্যতার বিকাশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের শরীরকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধার হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। ফলত ভ্যাক্সিনের উত্তরণের পথে মানুষই ক্লিষ্ট হয়েছে বেশি। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ভ্যাক্সিন আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে।

সালটা ১৯৫৫। চতুর্দিকে পোলিও রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যু এবং পঙ্গুত্ব শিশুদের মধ্যে এবং তাদের পরিজনদের মধ্যে এক চাপা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করেই চলেছে। Jonas Edward Salk সাহেবের পোলিও ইঞ্জেকশনে পোলিও প্রতিহত হচ্ছে এটি প্রমাণিত। জনমতের অসহনীয় চাপে, আমেরিকা বিভিন্ন কোম্পানিকে পোলিও ভ্যাক্সিন তৈরি করার লাইসেন্স দিয়ে দিল। কাটার ছিল এরকমই একটি কোম্পানি। দুর্ভাগ্যক্রমে কাটার কোম্পানির ভ্যাক্সিন নিয়ে ২৫০টি শিশু পোলিওতেই আক্রান্ত হয়ে পড়ল। গটনার তদন্ত করে দেখা গেল, যেখানে নিহত এবং নিষ্ক্রিয় পোলিও জীবাণু দিয়েই ভ্যাক্সিনটি তৈরি করার কথা, সেখানে কাটার কোম্পানির ভ্যাক্সিনে রয়ে গিয়েছিল কিছু জীবন্ত জীবাণু। ঐ জীবন্ত বা লাইভ ভ্যাক্সিনগুলোই ছিল যত নষ্টের গোড়া। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে ভ্যাক্সিন প্রয়োগের আগে আরো কঠোর নজরদারি দরকার। পরবর্তীতে আরো কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা নিয়মের ফাঁকফোঁকড়গুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন ১৯৭৬ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন— এর সঙ্গে গুলেন বেরি রোগের যোগাযোগ বা ১৯৯৯ সালে রোটা ভাইরাস ভ্যাক্সিন দেওয়ার সঙ্গে অন্ত্রের ইন্টাসাসেপশন নামক জট পাকিয়ে যাওয়ার ঘটনা ইত্যাদি। সময়ের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিকরাও সতর্ক হয়েছে ভ্যাক্সিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ভ্যাক্সিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়করা সতর্ক হয়েছেন নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে।

একটার পর একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা মানুষকে শিখিয়েছে ভ্যাক্সিন তৈরির নিয়মাবলী। একটি ভ্যাক্সিন তৈরি করতে গেলে কতগুলি পর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম পর্যায়ে ভ্যাক্সিন এবং তার মধ্যেকার আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় ছাড়পত্র দেওয়ার আগে। মানব শরীরে প্রয়োগ করার আগে সেটি কিছু মনুষ্যেতর প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করে, তার কার্যকারিতা ভালো করে দেখে নেওয়া হয়। প্রাণীর শরীরে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরে এটি মনুষ্য শরীরে প্রয়োগ করা হয়। মানুষের শরীরে আবার তিনটি পর্যায়ে এই পরীক্ষা করা হয়। প্রথম পর্যায়ে খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষকে ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। মূলত দেখা হয় ভ্যক্সিনটি নিরাপদ কিনা এবং সে কতটা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারছে বা তার ডোজ বা মাত্রা কত হবে। দ্বিতীয় বা সেকেন্ড ফেজে একটু বেশি সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ভ্যাক্সিনটি প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়ে মূলত দেখা হয় ভ্যাক্সিন-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং যে রোগের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিনটি তৈরি হচ্ছে তাকে সে কতটা প্রতিরোধ করতে পারছে। এখানে স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বেশি এবং এদের দুটো দলে ভাগ করে নেওয়া হয়। একদলের মানুষকে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হবে এবং অন্য দলকে ঔষধকল্প বা প্ল্যাসিবো প্রয়োগ করা হবে। কে ভ্যাক্সিন পাবেন আর কে প্ল্যাসিবো বা ঔষধকল্প পাবেন সেটা যিনি ভ্যাক্সিন নিচ্ছেন তিনিও জানবেন না বা যিনি ভ্যাক্সিন দিচ্ছেন তিনিও জানবেন না। এই পদ্ধতিটিকে ডবল ব্লাইন্ড স্টাডি বলা হয়। পর্যবেক্ষণের শেষে দুই দলের তুল্যমূল্য বিচার করে দেখা হয় ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ঔষধকল্পের তুলনায় কতটা বেশি। তৃতীয় পর্যয়েও ব্যাপারটা একইরকম, শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বেড়ে বেশ কয়েক হাজার হয়ে যায়। অবশ্যই এই তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের সময় লিঙ্গভেদ বা বয়সের তারতম্য যাতে না হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়।

এই তিনটি পর্যায়ের সমস্তরকম ফলাফল হাতে এলে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করার পরেই ভ্যাক্সিন-এর কার্যকারিতা প্রকাশিত হয়। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হল, ভ্যাক্সিন নির্মাতা কোম্পানিদের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করা এবং সেটি আমজনতার মাঝে কিভাবে বিতরণ করা যায় তার একটা খসড়া তৈরি করা। এতসব কর্মকাণ্ডের পরেই একটি ভ্যাক্সিন সাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র পেতে পারে বা জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আমেরিকার এফডিএ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংস্থায় এমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন বা আপৎকালীন ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য একটি সংস্থান আছে। এই সংস্থানের বলে এফডিএ সংস্থা যদি বোঝে যে দেশের আমজনতার জীবন রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয়তা বা পারমাণবিক কারণে বিপন্ন হয়ে পড়ছে, তাহলে তারা আপৎকালীন কিছু চিকিৎসার জন্য ছাড়পত্র দিতেই পারে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কিছু অননুমোদিত চিকিৎসার ছাড়পত্রও মিলে যায়। এই অনুমোদনের আপৎকালীন প্রয়োগ পুরোটাই নির্ভর করে মানুষের বিপন্নতার গুরুত্বের ওপর। আমেরিকার এফডিএ সংস্থার ভারতীয় সংস্করণ হল কেন্দ্রীয় ঔষধি মান নিয়ন্ত্রক বা সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অরগানাইজেশন। যদিও ২০০৮ সালে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠানের পর থেকে কোভিড-১৯ মহামারীর মতো অবস্থার উদ্ভব হয় নি, তাই

আপৎকালীন ব্যবহারের সংস্থান নিয়ে এর আগে আমাদের দেশে কখনও আলোচনা হয় নি। কিন্তু কোভিড অতিমারীর পরে, ভারতীয় এই সংস্থাটিও ইউরোপ এবং আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ভ্যাক্সিন-এর ক্ষেত্রে আপৎকালীন ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সেইজন্যেই তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার এই ভ্যাক্সিন আপৎকালীন ব্যবহারের মান্যতা পেয়ে গিয়েছে। এই আপাত তড়িঘড়ি প্রয়োগ নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই গণ-টিকাকরণ কোনো বিপদ ডেকে আনবে না তো? এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে লুই পাস্তুর-এর সময় থেকে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। বিজ্ঞানীদের নিরন্তর সাধনা আর প্রয়াস ভ্যাক্সিনকে করে তুলেছে আরো বেশি উপযোগী, কার্যকর আর স্বল্প পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত। এই লেখা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কোটি ভারতবাসী কোভিডের ভ্যাক্সিন পেয়ে গেছেন। ভয়ঙ্কর কোনো পাশ্বপ্রতিক্রিয়ার খবর কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। কোভিড ভ্যাক্সিনের আপৎকালীন প্রয়োগ কিন্তু এই এমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশনের হাত ধরেই। ফলত সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ভ্যাক্সিনটি বুঝি সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রমাণিত হওয়ার আগেই ব্যবহারের অনুমোদন পেয়ে গেল। আর তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে অহেতুক আতঙ্কের। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। কোভিড-১৯-এর ভাইরাস— যার পোশাকি নাম সার্স করোনা ভাইরাস, তার সঙ্গে আমাদের আগেই মোলাকাত হয়েছে। আগে সার্স মহামারী এবং মার্স মহামারীতে এই ভাইরাসের জ্ঞাতিভাইদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয় ঘটে গেছে। এদের নিয়ে অল্পবিস্তর কাজকর্মও চলছিল। অতিমারী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা তাদের সম্পদ এবং সঙ্গতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভ্যাক্সিন তৈরির যুদ্ধে। সমগ্র মানবজাতি যে বিপন্ন! এই বিশাল যুদ্ধে কোনও একক বিজ্ঞানী বা উদ্যোগপতির নাম করা মুশকিল। আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে পোলিও ভ্যাক্সিনের কথা বললে যেমন Jonas Salk সাহেবের নাম উঠে আসত বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্লেগের ভ্যাক্সিন বলতে Waldemar Haffkine-এর নাম করতেই হত, আজ ভ্যাক্সিনের মহাযুদ্ধে সকলের যৌথ ভূমিকাই উল্লেখ্য। শুধু তাই নয় *নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আমেরিকার বোস্টনে অবস্থিত হারভার্ড মেডিকেল স্কুলের ভাইরোলজি এবং ভ্যাক্সিন গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা Dan Barouch-এর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন — 'এই অতিমারী আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা বজায় রেখে, কত তাড়াতাড়ি ভ্যাক্সিন তৈরি করে ফেলা যায়।' ঐ নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, কোভিড ভ্যাক্সিন তৈরির প্রক্রিয়াটি খুব সম্ভবত ভ্যাক্সিন তৈরির ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করল। যদিও কোভিড ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা কতদিন থাকবে বা এটি ভাইরাসের রূপান্তরিত চেহারায় কতটা কাজে দেবে সে কথা বলার সময় এখনও আসে নি। তবু প্রাথমিক বিশ্লেষণ যথেষ্টই উৎসাহব্যঞ্জক।

যদিও ভারতে ভ্যাক্সিনের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ রাজত্বেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তৎকালীন বোম্বের হাফকিন সাহেবের নাম প্লেগ ভ্যাক্সিন বা কলকাতায় ম্যানসন সাহেবের নাম কলেরা ভ্যাক্সিন নিয়ে টুকরো টুকরো কিছু কাজ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে আমজনতার খুব লাভ কিছু হয় নি। সেই অর্থে গণ-টিকাকরণের ধারণার সূত্রপাত ঘটে ১৯৭৮ সালে। সেই বছর কাজাকস্তানে হু-র বার্ষিক অধিবেশনে ২০০০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতিরই ভারতীয় রূপায়নের একটি অংশ হল গণ-টিকাকরণ। শুরু হয়ে গেল টি বি, টিটেনাস টক্সয়েড, টিপল অ্যান্টিজেন (ডিপিডি), ডাবল অ্যান্টিজেন (ডি টি), পোলিও এবং টাইফয়েড-এর টীকাকরণ। এই নীতিরই বলিষ্ঠ রূপায়ন ঘটে ১৯৮৫ সালে যখন ভারত সরকার দ্বারা ইউনিভার্সাল ইম্যুনাইজেশন প্রোগ্রাম বা ইউ এই পি নামক একটি কর্মসূচি উদ্বোধিত হল। ধীরে ধীরে এই কর্মসূচির পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের অন্যতম ভ্যাক্সিন উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। সেই ভ্যাক্সিন শীতল বন্ধন বা কোল্ড চেন মেনে, দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে অসাধারণ মুন্সিয়ানা ভারতবর্ষ দেখিয়েছে, তা আজ সমগ্র বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম। ফলস্বরূপ সমগ্র বিশ্বের হাত ধরে ১৯৭৭ সালে গুটিবসন্ত মুক্ত হয়। ১৯৭৯ সালে এই গ্রহ থেকে গুটিবসন্ত রোগ বিদায় নেয়। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষকে পোলিও মুক্ত দেশ বলে ঘোষণা করা হয়। অথচ ভাবা যায় এই ভারতেই ২০০৯ সালে সারা পৃথিবীর অর্ধেক পোলিও রুগীর বাস ছিল? ২০১৬ সালে ভারতবর্ষের মা এবং নবজাতকেরা টিটেনাস মুক্ত বলে ঘোষিত হলেন। ভ্যাক্সিনের জয়রথের গতি আজ অপ্রতিরোধ্য।

১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু-র অতিমারীর প্রায় একশ বছর পরে পৃথিবী আবার এক অতিমারীর সম্মুখীন। এই সময়কালে নিঃসন্দেহে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। নতুন নতুন ওষুধ, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নতুন নতুন জীবাণুর দৌরাত্ম্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বা নতুন নতুন জীবাণুরোধক ওষুধ অনেক আশা জাগিয়ে এই ধারায় আবির্ভূত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় অকেজো (পড়ুন রেজিস্টেন্স) হয়ে পড়েছে। মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে কাঁচকলা দেখিয়ে জীবাণুরা ওষুধের মারণ ক্ষমতাকে পাশ কাটাতে নিজেদের খোল-নলচে বদলে ফেলেছে। সেইজন্যেই দেখুন, স্প্যানিশ ফ্লু-এর একশ বছর পরেও সার্স কোভ-২ নামক নতুন জীবাণুর মোকাবিলায় মানুষ নামক বুদ্ধিমান প্রজাতির হাতে আজ কিন্তু শুধুই পেন্সিল থুড়ি ভ্যাক্সিন। বাকি সব ঝুট হ্যায়।

তথ্যসূত্র :

Vaccines - Stanley A. Plotkin, Walter A. Orenstein, Paul A. Offit

deBary WT, (ed). The Budhhist Tradition in India, China and Japan. New York: Vintage Books:1972

Nature, News feature, Dec 2020 - The lighning-fast quest for COVID vaccines - and what it means for other diseases - The speedy approach used to tackle SARS-COV-2 could change the future of vaccine science. - Philip Ball

IAP Guidebook on Immunization 2018-19.

উমা

চিকিৎসা পেশার নৈতিকতার পুনর্গঠন

নুরেমবার্গ মেডিক্যাল ট্রায়াল, নতুন করে দেখা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

শেষাংশ

অতঃপর— আমাদের কাছে ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবে এল ইতিহাসের যে কোনও বাঁকে সর্বগ্রাসী পরমত-অসহিষ্ণু ডিকটেটরশিপ যখন রাজত্ব করে সে সময়ে বিজ্ঞান রাষ্ট্রের দর্শন দিয়ে পরিচালিত হয়। আমরা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের দেওয়া নতুন নিদান একবার মিলিয়ে নিতে পারি কিংবা আয়ুশ পাঠ্যক্রমের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি বা বিভিন্ন সময়ে অতিলৌকিক বিজ্ঞান নিয়ে সজোরে প্রচার করা, এগুলোকেও বিবেচনায় রাখব।

দু-তিনটে গোড়ার প্রশ্ন এখানে প্রায় সবাইকেই ভাবাবে মান হয়।

(১) হিটলারের জমানায় জার্মান বিজ্ঞানীদের এরকম ভয়াবহ আচরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহলে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার তরফে, রাশ টানার চেষ্টা করা হল না কেন? পল ওয়েন্ডলিং তাঁর 'নাৎসি মেডিসিন অ্যান্ড দ্য নুরেমবার্গ ট্রায়ালস' গ্রন্থে বলছেন— ''সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মান বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হত।'' তাঁর নিজের কথায়, ''The British and Americans launched programmes of wholesale transfer of German personnel to counter Soviet offers.'' ঐ গ্রন্থেই আরেক জায়গায় বলছেন— ''Nazi medicine was to strengthen the racial basis of society. One symptom was the monopoly capitalism og IG Farben, which commissioned pharmaceutical research in Auschwitz and Buchenwald.'' ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য নির্ভর যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণের চেষ্টা চলছে এবং তাতে কর্পোরেট পুঁজি যেভাবে রসদ সরবরাহ করছে তাতে আমরা সে সময়ের একটা ছায়া বোধহয় দেখতে পাব।

(২) যে চিকিৎসকেরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এরকম ভয়াবহ অত্যাচার করেছে কিংবা বর্তমানের গুয়ান্তানামো বে বা আবু ঘ্রাইবের মতো বীভৎস অত্যাচার কেন্দ্রে যে চিকিৎসকেরা মিলিটারি অত্যাচারকে প্রলম্বিত আর কার্যকরী করার জন্য সাহায্য করছে তারা যখন বাড়িতে ফেরে, নিজের পরিচিত জগতে ফেরে তখন তো তারা নিজেদের স্বাভাবিক প্রেমিক সত্তা, পিতৃসত্তা কিংবা বন্ধুসত্তা খুঁজে পায়। তাহলে এরকম দ্বৈত সত্তা কিভাবে জন্ম নেয়? নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ রবার্ট জে লিফটন এর একটা ব্যাখ্যা

দিচ্ছেন—The doctors thus brought a medical component to what I call an 'atrocity-producing situation'] one so structured, psychologically and militarily, that ordinary people can readily engage in atricities. Even without directly participating in the abuse, doctors may have become socialized to an environment of torture and by virtue of their medical authority helped sustain it. প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসক সত্তার একটি দ্বৈতায়ন বা 'ডাবলিং' হয়। চিকিৎসকের নিজের স্বাভাবিক সত্তার সাথে এক বিযুক্তিকরণ (ডিসোসিয়েশন) ঘটে এবং একইসাথে অত্যাচারের প্রক্রিয়ার সাথে ডাক্তারের সামাজিকীকরণ হয়, বিশেষ সময়কাল জুড়ে। ডাক্তাররা যখন স্বভাব শান্ত মানুষের হাতে মার খায় কিংবা মব লিঞ্চিং-এ যেসব সাধারণ মানুষেরা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে দিয়ে আমরা এই 'ডাব্লিং' বা দ্বৈতায়ন অনেকটা বুঝতে পারব।

(৩) এটা ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে আর পাঁচটা পেশার মতো মেডিসিনের পেশাকেও রাষ্ট্র প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি 'মেডিক্যাল ইথস' বা মেডিসিনের মানস সত্ত্বাকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি প্রবন্ধে (Lesoons from the Third Reich) মন্তব্য করা হয়েছিল— ''A major lesson from Nazi era is the fundamental ethical basis of medicine and the importance of an informed, concerned, and engaged profession." অস্যার্থ, নাৎসি মেডিসিন থেকে একটি প্রধান শিক্ষা হল যে মেডিসিনের মৌলিক নৈতিকতার ভিত্তি কি হবে এবং পেশাগতভাবে সচেতনভাবে বুঝে সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব কতটা এ বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া।

এই সামগ্রিক বিষয়টি অন্য মাত্রা পেয়ে যায় হিটলার-মুক্ত বর্তমান পৃথিবীতে— আমেরিকার গণতান্ত্রিক সমাজে। ১৯৬৪ সালে আমেরিকার ব্রুকলিনে Jewish Chronic Disease Hospital-এ ২২ জন রোগীর দেহে ক্যান্সার কোষের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল— ''Sins of Omission - Cancer Research Without Informed Consent"। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পরে বিচার শুরু হয়।

প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত আইজি ফারবেন কোম্পানির ম্যানেজার অ্যামব্রোস 'কঠোর' সাজা ভোগ করে ১৯৫২ সালে মুক্তির পরে এক ডজন কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি কোম্পানি সজ্ঞানে বর্তমানে নিষিদ্ধ ওষুধ থ্যাসিডোমাইড তৈরি করত। থ্যালিডোমাইডের ব্যবহারে গর্ভবতী মায়ের ৪০% ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিত। আইজি ফারবেন গোষ্ঠীর একটি কোম্পানি বায়ারের সাথে আরেক কুখ্যাত মারণাত্মক বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো-র সংযুক্তি হয়। এরা ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিক অব কঙ্গোয় সামরিক অভিযানের সাথী হয়ে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল কোল্ট্রান— একটি খনিজ পদার্থ যা থেকে নায়োবিয়াম এবং ট্যান্টালাম এই দুটি মহামূল্য ধাতু পাওয়া যায়। মিলিটারি-মেডিক্যাল-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল।

আউশভিৎসের নতুন ঠিকানা : আবু ঘ্রাইব কিংবা গুয়ান্তানামো বে

পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্বের জন্য আমেরিকার যুদ্ধোন্মত্ততা আজ বিশ্ববাসীর কাছে সুবিদিত। তেলের বাজারের দখল রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্যকে একটি সামরিক পরীক্ষাগার বানিয়ে তুলেছে। অন্যত্র খনিজ সম্পদ বা প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য একই ঘটনা ঘটাচ্ছে। আবার অন্যত্র সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট হিসেবে সামরিক ঘাঁটি রাখছে। একই সাথে সংখ্যায় নাৎসি জমানার মতো না হলেও মাত্রার দিক থেকে একই রকমের অত্যাচার চলছে কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে, আবু ঘ্রাইব, বাগ্রাম বা কিংবা সিআইএ-র 'ব্ল্যাক সাইটস'গুলোতে। অসংখ্য প্রামাণ্য দলিল এবং প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এসব জায়গায় অত্যাচারের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'আমেরিকান জার্নাল অব পাবলিক হেলথ'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের শিরোনাম— ''From Nuremberg to Guatanamo Bay: Uses of Physicians in the War on Terror"। হিটলারের সময়ে 'শুদ্ধ রক্ত'কে বর্তমান সময়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বলে লেখা হচ্ছে। এ প্রবন্ধে লেখকেরা বুঝতে চাইছেন কিভাবে কেন মেডিক্যাল পেশার সাথে যুক্ত ডাক্তার, নার্স সহ সব ধরনের মানুষ তাদের নিরাময় করার এবং সারিয়ে তোলার দক্ষতাকে একদিকে বন্দীদের ওপরে ক্ষত/ক্ষতি সৃষ্টির জন্য আর অন্যদিকে, রাষ্ট্রের তরফে এরকম ভয়াবহ বর্বরসুলভ অত্যাচারকে ধুয়ে-মুছে নির্বিষ প্রমাণ করার জন্য কাজ করে। শুধু তাই নয়, অত্যাচারকে লক্ষ্যভেদী করার জন্য ফিজিসিয়ান, সাইকিয়াট্রিস্ট সহ অ্যানথ্রোপলজিস্টরাও অংশগ্রহণ করে।

এই কুখ্যাত বন্দী শিবিরগুলোতে ঘটা বীভৎসতম অত্যাচারের কয়েকটি নাম ধরে বলা যায়।

(১) ওয়াটারবোর্ডিং — অত্যাচারের এই পদ্ধতিতে বন্দীর (অনেক সময়েই উলঙ্গ) মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে ক্রমাগত

জলে চোবানো হয় যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ডাক্তাররা শুশ্রূষা করে আবার অত্যাচার করার উপযুক্ত করে তোলে।

(২) দিনের পর দিন তীব্র উজ্জ্বল আলোতে ঘুম না পাড়িয়ে

রাখা। আবু ঘ্রাইবের আরেকটি ছবি। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত, অত্যাচারে বিকৃত মৃতদেহের পাশে আমেরিকান মহিলা মিলিটারির সহাস্য মুখ।

(৩) পাশের ঘরে বন্দীর বোন বা আত্মীয়ের ওপরে ধর্ষণ বা অন্য অত্যাচারের অসহ্য চিৎকার শোনানো। এসবের পরে বন্দী মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লে সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোলজিস্টরা আবার অত্যাচারের উপযোগী করে তুলত। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত 'ডক্টরস অ্যান্ড টরচার' প্রবন্ধে বলা হচ্ছে— ''A nurse, when called to attend to a prisoner who was having a panic attack, saw naked Iraqis in a human pyramid with sandbags over their heads''।

এখানে স্মরণ করব ১৯৪৫-এ প্রায় ২০ বছরের মধ্যে ভিয়েতনামের মাই লাই-এর গণহত্যার কথা। ১৯৬৮-র মার্চ মার্কিন সেনা মাই লাই গ্রামে ঢুকে একদিনে ৫০০ জনেরও

মাই লাই গ্রামে হত্যাকাণ্ড

বেশি ভিয়েতনামিকে হত্যা করে। মেডিক্যাল পেশার নৈতিকতা নিয়ে নুরেমবার্গ পরবর্তী জেনেভা কনভেনশনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মাই লাই ঘটে, আবু ঘ্রাইব বা গুয়ান্তানামো বে-র হিংস্রতম অত্যাচার চলে।

এরপরেও আমরা আমেরিকাকে কিন্তু ফ্যাসিস্ট বলিনি। ইরাকি প্রতিরোধকারীদের জেলের মধ্যে অত্যাচার করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার পরে বারাক ওবামা বলেছিলেন — ''উই হ্যাভ কিলড আ ফিউ ফোকস (আমরা কিছু অবাঞ্ছিত মানুষকে হত্যা করেছি)''। আমরা কিন্তু এরকম বলদর্পী, আগ্রাসী, শীতল হিংস্রতায় মোড়া কথাকেও হিটলারের কথা বলে দেগে দিইনি। আমেরিকা পুরোমাত্রায় গণতান্ত্রিক থেকেছে। যেমনটা দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ মিছিলে বড় লাঠি দিয়ে মেয়েদের গোপনাঙ্গে এবং পেছনে মেরে রক্তারক্তি করে দেবার পরে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলেও আমরা বিশ্বাস করছি গণতন্ত্রের মাঝে বাস করছি।

এরকম অ্যানাক্রনিজম তথা বিপরীতমুখিতার মাঝে বাস করে আমাদের মেডিক্যাল পেশা কিংবা ডাক্তারের 'নেগলিজেন্স' বা অবহেলা/অসাবধানতার কারণে রোগীর মৃত্যু হল কিনা এগুলো যেমন রয়েছে নৈতিকতার একটা দিক হিসেবে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রের তরফে চালানো অত্যাচারের সাথী হিসেবে ডাক্তারের অবস্থান কি হবে। ২০২০-র পৃথিবীতে সে ইতিহাস খুব উজ্জ্বল নয়। এমনকি একটি রাষ্ট্রের সহনাগরিকের ওপরে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া অত্যাচার চললেও ডাক্তাররা কোন অবস্থান নেবেন সে কথাও বোধহয় আজ গভীরে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

রাষ্ট্র এবং মানুষ — এ দুয়ের মাঝে আমাদের ডাক্তারদের স্থিতি, আমাদের দোলাচলতা, আমাদের অবস্থান বদল। মেডিক্যাল নৈতিকতার কেবলমাত্র একটি কোনও পাঠ নেই, বহু স্তরে স্তরায়িত। আমরা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র, হিংসা স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স (রাষ্ট্র এবং প্রশাসনের কাজের ফলে যে হিংসার শিকার মানুষ হয়) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে কি চোখে দেখব সেটা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিতান্ত জরুরি।

উ মা

আর নয় কাগজের কাপে চা কফি

নন্দগোপাল পাত্র

ক্যামেলিয়া সিনেনসিস (Camellia sinensis)। এরকম কঠিন নাম বললে অনেকেই হয়তো বুঝতে পারব না। কিন্তু এরই একটা ডাকনাম আছে, যার সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে একাত্ম হয়। চা। হ্যাঁ, বাঙালি হোক বা চিনা, চা ছাড়া দিনটা অনেকে ভাবতে পারেন না। প্রাচীন ভারতীয়রা কখনই চা-কে পানীয় হিসেবে গ্রহণ করত না বরং ঔষধি হিসেবে প্রাধান্য দিত। কিন্তু সময়ের সাথে তাদের স্বাদ বদলেছে। চা-এ এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান আছে যা ভালো স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

ইংরেজদের হাত ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশে চায়ের প্রবেশ ঘটে। তারা ভারতের আসাম রাজ্যে চায়ের চাষ শুরু করে। চা উৎপাদনে চীনের একক আধিপত্যকে রুখতে ব্রিটিশরা ভারতে চা চাষ শুরু করে। এভাবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পুরো ভারতবর্ষে চায়ের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে কেবল অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরাই চা পান করত। অঞ্চলভেদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চা-এর জনপ্রিয়তা ছিল বিভিন্ন রকম। দক্ষিণ ভারতের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চা-এর চেয়ে কফিকেই ভালবেসেছে। অন্যদিকে, পূর্ব ভারতে একই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মহার্ঘ এবং ক্ষতিকর মদ্যপানের চেয়ে চা-পানকেই শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে বর্তমানে সকল শ্রেণীর মানুষ চা পান করেন। শুধুমাত্র একটি জনপ্রিয় পানীয় নয়, ভারতবর্ষে চা আমাদের প্রতিদিনের যাপন-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত এক প্রিয় অভ্যাস হিসেবে জীবনধারার অঙ্গ হয়ে উঠেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। এ প্রসঙ্গে বলব গত শতকের তিরিশের দশকে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'মড়িঘাটের মেলা'য় দেখা যায় যে, গ্রাম বাংলায় দরিদ্র কৃষকের কাছে চা তখনও স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বিলাসী এবং দামি পানীয় — 'চায়ের দোকানের ভিড়ের মধ্যে দেখি মা অনিচ্ছুক ছোট ছেলের মুখের কাছে চায়ের ভাঁড় ধরে বলছে— খেয়ে নে, অমন করবি তো — এরে বলে চা— ভারি মিষ্টি— দ্যাখো খেয়ে— ওষুধ— জ্বর আর হবে না— আ মোলো যা ছেলে। চার পয়সা দিয়ে কিনে এখন আমি ফেলে দেব ক'নে? মুই তো দু ভাঁড় খ্যালাম দেখলি নে? খা—'।

গত শতকের শুরুতে অভ্যন্তরীণ প্রচার জোরদার হলেও জনপ্রিয় হওয়ার পথে এই পানীয়কে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং তিরিশের দশকে 'দি ইন্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড' (১৯৩৬) এবং স্বাধীনোত্তর কালে 'টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' গঠিত হওয়ার আগে চা একটি জাতীয় পানীয় হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। বিক্ষিপ্তভাবে জনপ্রিয় হলেও, একশো বছরেরও বেশি এই অভিযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে চা-এর কপালে জুটেছে নানা দুর্ভোগ। ২০১৮-এর এক সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে বছরে মাথাপিছু চা পানের গড় ৭০৫ গ্রাম, আর দেশে ৭৮০ গ্রাম।

চায়ের আড্ডায় তর্কের তুফান তুলতে বাঙালির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কথায় কথায় চায়ে চুমুক দিতে বাঙালি এক পায়ে খাড়া। নিছক আড্ডা, কেজো বৈঠক থেকে শুরু করে হাসপাতালে প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের খবরের উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা — মাঝ পথে চা অবশ্যম্ভাবী। চা পানের পাত্র হিসেবে চিনা মাটি বা পোর্সিলিনের কাপ, কাচের গ্লাস বা মাটির ভাঁড়ের বদলে বেশিরভাগ চা-এর দোকানে এখন কাগজের কাপ ব্যবহৃত হয়। ধোয়াধুয়ির খাটনি নেই, আর পরিবেশে মিশে যাওয়ার জেরেই ওই কাগজের এখন চাহিদা বেশ। বলা যায় প্লাস্টিকের সফল বিকল্প সেজে অনেকদিন আগেই জায়গা করে নিয়েছে কাগজের কাপ। উৎপাদক থেকে উপভোক্তা সকলেই কোনটা পরিবেশবান্ধব বা পরিবেশের শত্রু, তাঁরা তা জানতে চান না, বুঝতে চান না। তাঁরা বোঝেন শুধু সুবিধা। যেখানে সুবিধা পাওয়া যাবে সেটাই তাদের বান্ধব। ফলে যে হারে এখন সেই কাগজের কাপ ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে ঘুম উড়েছে বিশেষজ্ঞদের। কারণ কাগজের কাপকে টেকসই করার জন্য ব্যবহৃত হাইড্রোফোবিক ফিল্ম নামক প্লাস্টিকের পাতলা আস্তরণ। এই আস্তরণ গরম চা বা কফির ছোঁয়ায় গলে গিয়ে ছোট ছোট উপাদান বা মাইক্রোপ্লাস্টিক কণায় ভেঙে যায়। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক সরাসরি রক্তের সঙ্গে মেশে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জার্নাল অফ হ্যাজার্ডস মেটিরিয়ালস-এ Microplastics and other harmful substances released from disposable paper cups into hot water নামে একটি

গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ওই গবেষণাপত্রে খড়্গপুর-এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র এক গবেষক দলের বিজ্ঞানী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সুধা গোয়েল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দুই গবেষক বেদ প্রকাশ রঞ্জন ও অনুজা জোসেফ জানিয়েছেন, ১০০ মি.লি.গরম (৮৫-৯০ ডিগ্রি সে.) পানীয় থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ফ্লুরাইড, ক্লোরাইড, সালফেট এবং নাইট্রেট আয়ন প্রায় ২৫০০০ মাইক্রন আকারের মাইক্রোপ্লাস্টিক নির্গত হয়। একজন কাগজের কাপে যদি প্রতিদিন তিন কাপ চা পান করেন তাহলে ৭৫,০০০ মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা চায়ের সঙ্গে খাওয়া হবে। যা চা-প্রেমীদের চোখে ধরা পড়বে না।

এই মাইক্রোপ্লাস্টিক কণাগুলো দূষক আয়ন, প্যালাডিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুর বাহক হিসেবে কাজ করে এবং নানা ধরনের রোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল, প্লাস্টিকে থাকা বিষাক্ত উপাদান বিসফেনল— ক্যানসার সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বিশেষত মুখ ও গলার ক্যানসারের কারণ হতে পারে এই উপাদান।

এই পরিস্থিতিতে চা, কফি বা অন্যান্য গরম পানীয়ের জন্য যে কাগজের কাপ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোও ফেলে দেওয়ার সময় এসেছে। তাই এবার নতুন কিছু ভাবতে হবে। আর বাজারে সেই নতুন কাপ আসছে। ম্যাকডোনাল্ড আর স্টারবাকস-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের রিসাইক্লেবেল কফি কাপ। প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের গোড়াতেই। বিশ্বর প্রথম সারির উদ্ভাবকদের ডাকা হয়েছিল একটি প্রতিযোগিতার জন্য। প্রতিযোগিতার নাম ছিল নেক্সট-জেন কাপ। প্রত্যেকেই সেখানে কাপ, স্ট্র এবং লিড তৈরির জন্য কিছু অভিনব পরিকল্পনা জমা দিয়েছিল। আর সবদিক বিচার করে ১২ জন উদ্ভাবকের একটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বায়ো-পিবিএস লাইনিং দেওয়া বারে বারে ব্যবহারযোগ্য ভ্যাঙ্কুভার, সিয়াটেল, সানফ্রান্সিস্কো এবং লন্ডনে তাদের নিজস্ব বিপনিতে ব্যবহার সবে শুরু করেছে। ওই কাপ বাজারে আসতে আসতে ২০২২ গড়িয়ে যাবে। বায়ো-পিবিএস লাইনিং দেওয়া কাপ সাধারণের জন্য কবে মিলবে বা কাপের দাম সম্পর্কে বহুজাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়নি।

এক্ষেত্রে সুস্থ জীবনের স্বার্থে কাগজের কাপ উৎপাদন বন্ধ করা যেতেই পারে এবং বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব মাটির ভাঁড় ব্যবহার করতে হবে। অভিজ্ঞতা বলছে, এ বিষয়ে কড়াকড়ি থাকলেও, কিছু দিন পরেই নজরদারি শিথিল হতে শুরু করে। এ বারও নজরদারি শিথিল হলেই ফের কাগজের কাপের ব্যবহার আবার রমরমিয়ে বাড়বে এমন আশঙ্কা পরিবেশপ্রেমীদের। তা-ই কাগজের তৈরি কাপ নিয়ে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, পরিবেশকর্মীদের নিরন্তর প্রচার ও সক্রিয় উদ্যোগই পারবে অল্প পরিমাণে হলেও মাইক্রোপ্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ পৃথিবী গড়ে তুলতে।

উমা

সত্যিই কি আলোর পথে পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর সমাজ?

ঊষসী চৌধুরী

প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞান ও সত্যের সাধনা বিক্ষিপ্তভাবে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল, অন্যদিকে প্রান্তিক ও অরণ্যে বসবাসকারী জনজাতি মানুষ সেই জ্ঞানের স্পর্শটুকু পায়নি। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে বিদেশীদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা সামাজিক পরিমণ্ডলকে আমূল পাল্টে দেয়, অবশেষে সমস্ত কিছুই ব্রিটিশদের করায়ত্ত হয়, এবং শোষণ ও বঞ্চনার গ্লানি নিয়ে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী সমাজে, দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সাথে একাত্ম না হতে পেরে ব্রিটিশ সরকার অনেক সময় বেশ কিছু কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল নিজেদের স্বার্থে, এবং তার ফলাফল ভোগ করতে হয়েছে জনসাধারণকে। তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একের পর এক কুখ্যাত আইন। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার পাশ করেছিল স্বভাব ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট। এই আইন দ্বারা সারা ভারত জুড়ে প্রায় ১৫০টি উপজাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পুলিশকে 'অপরাধপ্রবণ' জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষদের উপর কড়া নজর রাখার ও তাদের যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

এইসব জনজাতির প্রান্তিক মানুষকে জন্ম থেকে অপরাধী ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকারের কুখ্যাত আইনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল এই আইনটি। মানভূম জেলা থাকাকালীন ব্রিটিশ সরকার ছোটনাগপুরে এই কালা আইন চালু করেছিল। এর ফলে পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবররা ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্টের আওতায় আসে এবং বিভিন্ন স্থানে পুলিশ দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। সেই সময় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১১০ ধারায় খেড়িয়া শবররা গ্রেপ্তার হত। পুলিশ ও প্রশাসনের ভয়ে তারা লোকালয়ের বাইরে গিয়ে জঙ্গলে বসবাস করত। তাদের স্থায়ী ঠিকানা বলতে কিছু থাকত না। জাতীয় আন্দোলনে খেড়িয়া শবরদের ভূমিকা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এ কারণেও তাদের অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়ে যাওয়ার পরেও এই আইনের অবসান ঘটানো হয়নি। ১৯৫২ সালের ৩১ আগস্ট এই সমস্ত উপজাতিগুলি 'বিমুক্ত জাতি' বা ডি-নোটিফায়েড ট্রাইবস্ হিসাবে ঘোষিত হয়।

বিমুক্ত গোষ্ঠী ঘোষিত হওয়ার পরও শবরদের দীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর জন্যে। স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম তাদের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় গোপীবল্লভ লাল সিংহ। 'শবর পিতা' নামেই যিনি অধিক পরিচিত। ১৯৬৮ সালে মানবাজার থানার জুদা গ্রামের বুধন শবরের আহ্বানে স্থাপিত হয় 'খেড়িয়া শবর সমিতি'। ১৯৮৩ সালে মানবাজার থানার কুদা গ্রামে ঘটে যাওয়া একটি ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুদা ও তুড়াং গ্রামের অধিবাসীগণ শবরদের বয়কট করে। ঠিক একই সময়ে খেড়িয়া শবরদের উপর ঘৃণা ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে মহাশ্বেতা দেবী এই সমিতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর যোগদান উপলক্ষে মালডিতে শবর মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং শবর সমিতির পুনর্নামকরণ হয় 'পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি'। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে শবররা এসে ঐ মেলাতে যোগদান করেছিলেন। কালক্রমে শবরদের উন্নয়নকল্পে এগিয়ে আসে কয়েকটি সমিতি যেমন— পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, কলকাতা সেন্টার ফর মাস কমিউনিকেশন। তবে শবরদের কল্যাণে মহাশ্বেতা দেবী যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা এককথায় অতুলনীয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্থানে শবর সমিতি গঠন করা, শবরদের ঐক্যবদ্ধ করা ও মদ্যপান বন্ধ করানো। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন শবরদের একান্ত আপনজন— 'শবর জননী'। এ প্রসঙ্গে অনেকেই মহাশ্বেতা দেবীর শবর সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে লিখেছেন এবং তাঁরই আন্তরিক প্রয়াসে শবর সমাজের মানুষজন প্রচারের আলোয় আসে। সম্ভবত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর উৎসাহেই শবর সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্যে স্কুল পরিচালনা করতে শুরু করেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে লব্ধ ১০ লক্ষ টাকা শবরদের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শবররা হয়েছিল মাতৃহারা।

বর্তমানে শবররা ঠিক কি পরিস্থিতিতে দিনযাপন করছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক। আজও বেশিরভাগ শবর পরিবারের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচে। তাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কিন্তু বেশিরভাগই বর্তমানে অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত, যেমন — জঙ্গল থেকে শালপাতা কুড়িয়ে এনে ঠোঙা বানানো; বাঁশ, কাসিঘাস দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরি করা; কাঠ কুড়িয়ে এনে তা বিক্রি করা প্রভৃতি। শবর ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। ১৭-১৮ বয়র বয়সী অনেক ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে কর্মসংস্থানের জন্য পাড়ি দেয়। সেখান থেকে তারা যা উপার্জন করে তার বেশিরভাগ অংশ নেশাদ্রব্য কিনতে ব্যয় করে ফেলে। অনেক সময় পরিবারে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে। মেয়েদের বিশেষ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১২-১৩ বছর বয়স হলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। পাত্র বেকার বা অযোগ্য হলেও অনেক সময় কিছু যায় আসে না। বিয়ে হয়ে গেলে বাপের বাড়ি থেকে মেয়ের আর কোনও দায়িত্ব নেওয়া হয় না। প্রেমজ বিবাহ ও সম্বন্ধ বিবাহ দুই-ই প্রচলিত আছে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে এখনও মেনে নেওয়া হয় না। কেউ এ ধরনের কাজ করলে তাকে 'একঘরে' ঘোষণা করে দেওয়া হয়। সমাজে ডাইনি প্রথার মতো কুসংস্কার এখনও রয়ে গিয়েছে।

শবরদের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ভাত হল তাদের প্রিয় খাদ্য। তিন বেলা তারা ভাত খায়। রুটি জাতীয় খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস তাদের নেই, সাপ্তাহিক রেশন থেকে তারা যা বরাদ্দ গম পায় তা তারা বিক্রি করে দেয়। শবরদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব আখান পরব। বাঙালিদের পুজো বা উৎসব তারা দেখতে যায় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না। নিজস্ব চিকিৎসাব্যবস্থার উপর নির্ভর না থেকে তারা

আজকাল সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করছে। অসুখ হলে তারা গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরীক্ষা করায়, সদর ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে যায়। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ এ ধরনের রোগ হলে সরকার থেকে সাহায্য পায়।

মাতৃত্বকালীন বিভিন্ন সুবিধাও তারা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পের দ্বারা বেশিরভাগ শবর গ্রামের অধিবাসীরা তাদের বাড়ি করতে পেরেছে। আবার কিছু মানুষ এই সুযোগ থেকে এখনও বঞ্চিত রয়ে গেছে। এই সময়ে দাঁড়িয়েও অনেকের আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড নেই, তারা এগুলির গুরুত্বও বোঝে না, এটি একই সাথে উদ্বেগজনক আবার দুঃখজনক ঘটনা।

তবে আশার কথা এই যে পুরুলিয়ার শবর ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে পা রাখছে। কয়েক বছর আগে শবরদের মধ্যে থেকে প্রথম স্নাতক হয়েছিলেন নির্মল প্রসাদ শবর। বর্তমানে তিনি একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত। পুরুলিয়ার শবর সমাজের মধ্যে তিনিই একমাত্র সরকারি চাকুরে। ২০২০ সাল করোনা অতিমারীর কারণে যতই বিষময় হোক না কেন, এই বছরটি সমগ্র খেড়িয়া শবর সমাজে একটি সুখময় বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল। কারণ বরাবাজার থানার অন্তর্গত ফুলঝোর গ্রামের অধিবাসী রমণিতা শবর। শবর মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রমণিতা ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক দুটি স্তরে সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এরপর সে পটমদা কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। গত বছর স্নাতক স্তরের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় সে শুধুমাত্র ফার্স্টক্লাস সহকারে পাশই করে নি, কলেজের ইতিহাস বিভাগে সে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। বর্তমানে সে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরতা। পড়াশোনার পাশাপাশি সে শবর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয় 'স্বপ্নের স্কুলবাড়ি'-র শিক্ষিকা। উক্ত ট্রাস্টের প্রকল্প 'স্বপ্নকুটির'-এর জন্য রমণিতা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে শবর মেয়েদের উন্নয়নের জন্য এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারের জন্য জেলা প্রশাসন তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর নিযুক্ত করেছে। রমণিতা তার এই সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্ব দিতে চায় তার বাবা-মাকে। তার কথায়— 'বাবা মা যদি আমাকে নিজের মতো করে বাঁচার স্বাধীনতা না দিত ও পাশে না থাকত, আমি কখনোই এই জায়গায় এসে পৌঁছোতাম না।' রমণিতার দেখানো পথ ধরে আরো অনেক শবর কন্যা এগিয়ে আসছে। চারজন মেয়ে এখন স্নাতক স্তরে পঠনরতা। ছেলেদের মধ্যে এই সংখ্যা ১৫-১৬ জন। গত বছর দুজন ছেলে মাধ্যমিক পাশ করেছে। বরাবাজার থানার সিন্দরি গ্রামে অবস্থিত শবর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পরিচালিত 'স্বপ্নের স্কুলবাড়ি' আবাসিক বিদ্যালয়ে বেশ কিছু শবর পরিবারের ছেলেমেয়েরা বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করছে।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে 'অপরাধপ্রবণ জাতি'র যে তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছিল সেই পর্ব থেকে তারা কি এখনও বেরিয়ে আসতে পেরেছে? এর উত্তরে বলা যায় ২০-২৫ বছর আগেও তারা পুলিশ ও প্রশাসনকে যথেষ্ট ভয় পেত। বর্তমানে তারা যে একেবারে এই ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তা নয়। এখনও স্বভাবগতভাবেই তারা পুলিশের গাড়ি দেখলে লুকিয়ে পড়ে। তবে নিজেদের সমাজের বাইরে গিয়েও তারা বহির্জগতের সাথে মেলামেশা করছে। কর্মসূত্রে ও পড়াশোনার তাগিদে অনেকেই শহরমুখী হয়েছে। আমি নিজে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে গবেষণার কাজের সূত্রে প্রান্তিক জনজাতি সাঁওতাল, শবর ও অন্যান্য পিছিয়ে পরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হচ্ছি— প্রয়োজন ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সর্বোপরি রমণিতা শবর বা নির্মল প্রসাদ শবরের মতো ছেলেমেয়েরা উঠে আসছে। ভবিষ্যতে শবর সমাজ থেকে এরকম আরও অনেক ছেলেমেয়ে উঠে এলে হয়তো মহাশ্বেতা দেবীর স্বপ্নের প্রকৃত বাস্তবায়ন ঘটবে।

তথ্যসূত্র :

- Dilip D' Souza, De Notified Tribes: Still 'Criminal'?, *Economic and Political Weekly*, Vol. 31 No.51, p. 3576
- ড. সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর সমাজ, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদিত), *অহল্যাভূমি পুরুলিয়া* (দ্বিতীয় পর্ব), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪।

উমা

হোমিওপ্যাথি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞানের উপর নয়

প্রমোদরঞ্জন রায়

Super-Avogadro dilution কথাটির অর্থ কী জানেন? তার আগে অ্যাভোগাদ্রো-র সম্বন্ধে কিছু বলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শুরুর দিকে গ্যাসের ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতে করতে ইতালীয় বিজ্ঞানী অ্যামেদিও অ্যাভোগাদ্রো বললেন, একই তাপমাত্রা এবং একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সম-আয়তনের দুটি গ্যাসের মধ্যে সমসংখ্যক অণু বর্তমান থাকে। তার কিছুদিন পরই মলিকিউলার থিয়োরিতে তিনি আরেকটি হাইপোথেসিস যোগ করলেন, তা হল এক আণবিক গুরুত্বের (মলিকিউলার ওয়েট) সমান ওজনসম্পন্ন (বা 1 mol.) সকল মৌল এবং যৌগপদার্থের মধ্যে একই সংখ্যক অণু বিদ্যমান। জল (H_2O) এবং নুন (NaCI)-এর আণবিক গুরুত্ব যথাক্রমে ১৮ এবং ৫৮.৫, তাই ১৮ গ্রাম জলের মধ্যে H_2O অণুর সংখ্যা এবং ৫৮.৫ গ্রাম নুনের মধ্যে NaCI অণুর সংখ্যা সমান।কিন্তু এই সংখ্যাটি কত সেটা তিনি বলে যেতে পারেন নি। পরবর্তীকালে সংখ্যাটি যখন অবিষ্কৃত হল, তখন বিজ্ঞানীকে যোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য তার নাম দেওয়া হল 'Avogadro's Number'। কেউ কেউ আবার নাম দিলেন, 'Avogadro's Constant'। 'Constant' শব্দের অর্থ হল 'ধ্রুবক'। অর্থাৎ ধ্রুবতারার মতো যা স্থির এবং অপরিবর্তনশীল। দশ লক্ষ বছর পরে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও এই সংখ্যাটির মানের কোনও পরিবর্তন হবে না। সংখ্যাটি হল 6.022×10^{23}।

এবার আসি Super-Avogadro dilution। একভাগ ওজনের কোনও পদার্থকে দশ ভাগ ওজনের কোনও দ্রাবকে দ্রবীভূত করার পর লব্ধ দ্রবণ থেকে একভাগ নিয়ে সেই একই দ্রাবকের নয় ভাগের সঙ্গে মিশিয়ে পুনরায় দশ ভাগ করা হল। dilute করার এই পদ্ধতিটি যদি বারংবার করা হয়, তবে একটা ধাপের পর সেই দ্রবণে মূল পদার্থের একটি অণুও বিরাজ করবে না বা পদার্থটির কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। একেই বলা হয় Super-Avogadro dilution। অ্যাভোগাদ্রো সংখ্যাই বলে দেয় যে কোন পদার্থের 10 times dilution যদি ২৪ বার করা হয় তাহলে দ্রবণের মধ্যে সেই পদার্থের অণুর সংখ্যাটির গাণিতিক মান হবে ১-এরও কম। বাস্তবে পদার্থটির আর কোনও অস্তিত্বই থাকা সম্ভব নয়।

যে হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো আপনি খান সেগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীকে যে ওষুধ দেওয়া হয় তা তৈরি হয় মূল ওষধি (মাদার টিংচার) বা অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডকে বারংবার dilute করে। যে ওষুধ যত বেশি diluted তা তত বেশি potent বা শক্তিশালী। ওষুধের গায়ে নামের পর একটা সংখ্যা থাকে, যেটা 3, 6, 12, 30, 60, 120 এমনকি 1200-ও হতে পারে। তারপর থাকে দুটি অক্ষর যার প্রথমটি X, C অথবা M এবং পরেরটি H অথবা K। এবার দেখা যাক, এই সংখ্যা এবং অক্ষরগুলির অর্থ কী? তবে শুরু করব শেষের দিক থেকে, নাহলে সাসপেন্সটা আগেই চলে যাবে।

শেষ অক্ষর H-এর অর্থ Hahnemann Method এবং K-এর অর্থ Korsakovian Method। অর্থাৎ কোন dilution পদ্ধতিতে ওষুধটি তৈরি করা হয়েছে। তার ঠিক আগের অক্ষরের অর্থ কত ভাগ দ্রাবকের সঙ্গে মাদার টিংচারটি মেশানো হয়েছে। X (decimal dilution) মানে 10 times, C (centesimal dilution) মানে 100 times (সর্বাধিক প্রচলিত) এবং M (millesimal dilution) মানে 1000 times dilution। এবার আসি প্রথম সংখ্যাতে। এই সংখ্যাটির অর্থ কতগুলি ধাপে এই 1:10 বা 1:100 অথবা 1:1000 অনুপাতে dilution করা হয়েছে। 30 মানে 30 ধাপে, 1200 মানে 1200 ধাপে। আগেই বলেছি 10 times dilution পদ্ধতিতে Super-Avogadro dilution তৈরি হতে 24 ধাপ লাগে। সুতরাং 100 times আর 1000 times dilution method-এ সংখ্যাটি হবে যথাক্রমে 12 এবং 8। ঘুরিয়ে বললে, 24X– 12C এবং 8M-এর অধিক potency- সম্পন্ন ওষুধ খাওয়া মানে আপনি কোন ওষুধ খাচ্ছেন না খাচ্ছেন শুধু দ্রাবক যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জল আর অ্যালকোহল ছাড়া আর কিছুই না।

উমা

সংগঠন সংবাদ

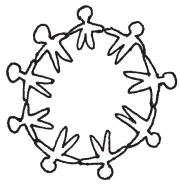

অবশেষে বিশ্বকাঁপানো অতিমারী কোভিড-১৯ ভাইরাস ভীতি কাটিয়ে হরিণঘাটা ব্লকের উত্তর রাজাপুরে বিদ্রোহী সংঘের পরিচালনায় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ৩৮তম গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব গত ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১তারিখ শনি ও রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন গাঁয়ের খেলার মাঠে সর্বাগ্রে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া উৎসবে পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকাশ উন্মুখ কুসমকলির মতো নয়নানন্দ সুশৃঙ্খল মার্চপাস্টের মাধ্যমে পতাকাকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিবাদন গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক ও অতিথিবৃন্দ মহোদয়গণ।

প্রাক্ উদ্বোধনকালে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯৮৪ সালের প্রথম গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব থেকে আজ পর্যন্ত যতজন ক্রীড়া উৎসব কর্মী প্রয়াত হয়েছেন এবং সম্প্রতিকালে গত এক বৎসরে অতিমারী করোনার কারণে যে সকল পরিযায়ী শ্রমিক, শিশুশ্রমিক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে পথে অনাহারে জলকষ্টে, বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারিয়েছেন এবং করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানব সেবায় প্রাণ হারিয়েছেন, সর্বস্তরের সেই সকল সেবক/সেবিকাদের সকলের জন্য দুঃখ প্রকাশপূর্বক ১ মিনিট নীরবতা পালন করে তাদের প্রত্যেকের স্মৃতির প্রতি এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। অপরদিকে যে সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ করোনা অতিমারীর সফল চিকিৎসা ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানানো হয়।

মশাল দৌড় পর্ব শেষে প্রতিযোগীগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর পর মাননীয় উদ্বোধক মহাশয় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। শপথবাক্য পাঠের পর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিনের শেষে মহড়া পর্ব শেষ হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় তিন কিলোমিটার 'রোডরেস' অনুষ্ঠিত হয়। ৮৫ জন মহিলা-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সফল সকলকেই পুরস্কৃত করা হয়। সকাল ১০টায় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। মধ্যাহ্নে সকলের জন্য লঘু আহারের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে মহিলা প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়। ছোট মাঠে এবারের ইভেন্ট ২০০০ মিটারের শিহরণ তোলা দৌড়। সঞ্চালক মহাশয়ের সুনিপুণ পরিচালনায় নির্বিঘ্নে দুদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরপর অশীতিপর মাননীয় নিরঞ্জন বিশ্বাস (নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটির টানা ৪০ বছরের সভাপতি ও ক্রীড়া সংগঠক)-কে এবং আমন্ত্রিত অতিথি মহোদয়গণকে উত্তরীয় পরিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতি মহাশয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠু সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক

শুকুর আলি মণ্ডল, সভাপতি

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা। উ: রাজাপুর।

আমফানে চুঁচুড়ায় বহু গাছ পড়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে কিছু গাছ খুবই প্রাচীন। কৌতূহলীর পক্ষ থেকে চুঁচুড়া শহরে ও আশপাশের গ্রামে কিছু গাছ লাগানো হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে সেগুলো নিয়মিত দেখভাল করা হচ্ছে।

দুর্গাপূজার সময় শব্দদূষণ বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর ২০২০ কৌতূহলীর পক্ষ থেকে লাগাতার প্রচার চালানো হয়, প্রচার চলাকালীন গান-আবৃত্তি-নাটকের আয়োজন করা হয়। তোলাফটক মোড়, হাটের মোড়, ঘড়ির মোড় ও হুগলি মোড়ে প্রচার অনুষ্ঠানগুলি চলে। স্থানীয় শিল্পী গোপাল ভৌমিক দূষণবিরোধী গান গেয়ে প্রচারে অংশ নেন। চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব, বিকাশ মঞ্চ, আরবান টাইমস ও বিবর্তন (চন্দননগর) সহযোগী সংগঠন হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

জানুয়ারি ২০২১ থেকে কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা চুঁচুড়া ও আশপাশের এলাকায় খাবারে রং ও ভেজাল নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চালবে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই প্রচার কাজে অংশ নেবার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

প্রদীপ দত্ত,

কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষে।

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় উৎস মানুষ

১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কলকাতায় মৌলালির রামলীলা ময়দানে 'হেই সামালো'-র উদ্যোগে যে সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হয় তাতে উৎস মানুষ অংশ নেয়। লিটল ম্যাগাজিনে আগ্রহী মানুষ কিছু এসেছিলেন, তবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণে আসা মানুষের সংখ্যা ঢের বেশি ছিল।

৪-৬ মার্চ ২০২১ লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ আয়োজিত ১৪তম সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিবারের মতো এবারেও উৎস মানুষ তাতে অংশ নেয়। মেলায় পত্র-পত্রিকার জন্য আলাদা করে টেবিলের ব্যবস্থার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা গান-কবিতা-নাটক করেন।

অকালে প্রয়াতা 'থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের মা'

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরে শহীদ গোপীনাথ সাহা স্ট্রিটের বাসিন্দা নাসরিন বেগম (৪৮)। গত ১৮ মার্চ পেটের যন্ত্রণায় শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন ১৯ মার্চ ভোরে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বর ভিড়ে ভিড়। অসংখ্য থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকরা হাজির। শ্রীরামপুর সেবাকেন্দ্র ও চক্ষুব্যাঙ্কের সদস্যদের নিঃশব্দ পদচারণা। এছাড়া সমাজে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত বহু মানুষ। সকলেই যেন বাকরুদ্ধ। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা কাঁদছে যেন তাদের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। রক্তদান আন্দোলনের কর্মীরাও হাজির। দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে রমেশ চন্দ্র দেব স্মৃতিরক্ষা সমিতির নন্টু দেব। নন্টু আর নাসরিন বিগত ২১ বছর ধরে এই শহর ও তার সন্নিহিত এলাকার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু-কিশোরদের নয়নের মণি। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই সব হতভাগ্য আক্রান্তদের রক্ত জোগাড় করা ও প্রয়োজনীয় 'ডেসফেরাল' ইনজেকশন দেবার সব দায়িত্ব নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন মানুষের অর্থ সাহায্যে নিখরচায় এই পরিষেবা দেওয়াই ছিল নন্টু-নাসরিনের নিত্য কাজ। নাসরিন ছিল অন্যের বিপদের দিনে একান্ত বন্ধু। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের পরিচর্চার পাশাপাশি মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক আপত্তিতে মৃত্যুর পর তাঁর এই আদর্শকে সম্মান দেখানো যায় নি। এছাড়া স্বেচ্ছা রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাও তার নেশা ছিল। এই কাজে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রচারের কাজে ছুটে যেতেন নাসরিন। গত ২৭ মার্চ শ্রীরামপুর সেবাকেন্দ্র ও চক্ষুব্যাঙ্কে প্রয়াত নাসরিনের স্মরণে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা নাসরিনের মানবসেবার নানাদিক তুলে ধরেন। এই দিনের স্মরণসভায় প্রয়াত নাসরিনের আন্তরিক ইচ্ছা— শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের 'ডে কেয়ার ইউনিট' শীঘ্রই গড়ে তোলার দাবি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সীতাংশু ভাদুড়ী

এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ কথা

৯ নভেম্বর ২০২০ প্রয়াত হন শংকর ভাদুড়ী (১৯৩৪-২০২০)। শ্রীরামপুরনিবাসী উৎস মানুষের একজন মনোযোগী পাঠক। আমৃত্যু নিজের যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন শংকরবাবু। গড়পড়তা মানুষের মতো চারপাশে ঘটে চলা যুক্তিহীনতার স্রোতে গা ভাসাননি। তাঁর প্রয়াণে পরিবারের পক্ষ থেকে যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় তাতে শংকরবাবু যে অন্তিম ইচ্ছে লিখে রেখেছিলেন তা জানতে পারি — ''আমার প্রয়াণে দেহদান হোক বা সৎকার — তারপর তথাকথিত অশৌচান্ত, কোনো নিয়ম মানতে হবে না। এমনকি 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন' নামক পূজা অনুষ্ঠানও করতে হবে না। আমার নশ্বর দেহ, তথা আত্মা দ্বারা সংসারের কোনো অমঙ্গল হবে না।'' অতিমারীজনিত পরিস্থিতিতে ওঁর দেহদান/চক্ষুদান করা যায়নি, তবে শংকরবাবুর অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করা হয়নি। প্রায় শ'খানেক মানুষের উপস্থিতিতে ২২ নভেম্বর শ্রীরামপুর নেতাজী পাঠাগারে তাঁর শ্রদ্ধা ও স্মরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আমরা বেশ কিছু নামী ব্যক্তির কথা জানি যাদের মরণোত্তর দেহদান/চক্ষুদান করার অঙ্গীকার পরিবারের মানুষেরা কানে তোলেননি। এমনকি সংস্থার মাধ্যমে দেহদান/চক্ষুদান-এর অঙ্গীকার করা হয়েছিল তারা পরিবারকে সেকথা মনে করিয়ে দিলে সেই সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকদের দূরদূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯৯৫-তে প্রয়াত ব্যক্তি চক্ষুদান করলে শবদাহের খরচ মকুব করা যায় কিনা তা কলকাতা পৌরসভায় আলোচনার পর্যায়ে ছিল। সংবাদপত্রে খবরটি শংকরবাবুর চোখে পড়ে। তিনি শ্রীরামপুর পৌরসভাকে চক্ষুদাতাদের জন্যে 'নিঃশুল্ক শবদাহ' চালু করার আবেদন করেন। শংকরবাবুর আবেদনে সাড়া দিয়ে এ রাজ্যে শ্রীরামপুর পৌরসভাই প্রথম ব্যবস্থাটি চালু করে।

শংকর ভাদুড়ীদের মতো মানুষ আমাদের সমাজে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ হয়েও তিনি এক অসাধারণ নজির রেখে গেলেন।